সুমন্ত আসলাম

দস্ত্যন রুহমান

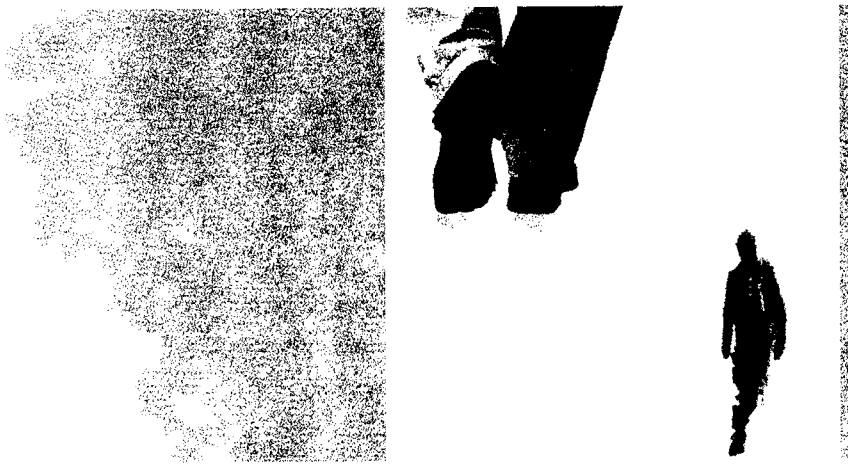

সুমন্ত আসলাম

দস্ত্যন রুহমান

দস্ত্যন রুহমান
সুমন্ত আসলাম

তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০০৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০০৯
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০০৯

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : নজরুল ইসলাম বাহার
শিখা প্রকাশনী ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

অক্ষরবিন্যাস : ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : সুইষ সৌম্য

মূল্য : ১২৫ টাকা

ISBN : 984-454-223-6

খুব ভালো একটা আশ্রয় ছিল আমাদের, এটা তো আপনার জানা কথা। সেই আশ্রয় পেয়ে আমরা যখন লেখা শুরু করি, তখন কয়েকজন বেশ ভালো লিখতেন, তাঁদের মধ্যে আপনিও ছিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই আমি তাই বলি, প্লিজ, লেখাটা চালিয়ে যাবেন।

প্রিয় জেবতিক, প্রিয় আরিফ জেবতিক

আপনার মতো ব্যবসায়ী দেশে অনেক আছেন, কিন্তু আপনার মতো লিখতে পারেন কজন?

সুতরাং আবারও বলি—প্লিজ, লেখাটা চালিয়ে যাবেন।

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দস্তান রুহমান

খুব ব্যস্ততা নিয়ে কাজ করছেন মহিলাটি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি আমি তার দিকে। একটু পর পর তার ফোন আসে, হ্যালো হ্যালো করে দু-একটা কথা বলে ফোনটা রেখে দেন তিনি দ্রুত। বেশ কিছুক্ষণ পর কাজের ফাঁকে এক পলক আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আবার কাজে মনোযোগ দিয়ে বললেন, 'ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন, কী দেখছেন আপনি?'

বেশ লজ্জা পেলাম আমি। বললাম, 'ঠিক আপনাকে দেখছি না, একজন পুলিশকে দেখছি।'

'আগে কখনো পুলিশ দেখেননি?'

'দেখেছি, কিন্তু কোনো মেয়ে-পুলিশ দেখিনি।'

'কী বলেন! দেশে এত মেয়ে-পুলিশ আর আপনি বলছেন এখনো কোনো মেয়ে-পুলিশ দেখেননি!'

'না, দেখিনি যে ঠিক তা নয়, রাস্তা দিয়ে তাদের হেঁটে যাওয়ার সময় কিংবা গাড়িতে বসে কোথাও যাচ্ছেন তারা, তখন দেখেছি। এত কাছ থেকে কখনো দেখিনি।'

'তাই নাকি!' কী যেন লিখছিলেন তিনি। টেবিলের ওপর কলমটা ছুড়ে দেওয়ার মতো রেখে দিয়ে বললেন, 'তা এত কাছ থেকে দেখে এখন কী মনে হচ্ছে আপনার?'

'মেয়েরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।'

'আপনি একটা মেয়ে-পুলিশকে খুব কাছ থেকে দেখে বুঝতে পারলেন মেয়েরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে! এর আগে বুঝতে পারেননি?'

'ওভাবে ঠিক ভাবা হয়নি তো।'

'শুনুন মিস্টার, মেয়েরা এখন কেবল ভাতই রাঁধে না, কেবল বাচ্চাই জন্ম দেয় না, তারা এখন বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে, বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধও করছে, মহাশূন্যেও যাচ্ছে।'

'এমনকি তারা দেশও চালাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এবার তাহলে বুঝুন।' কলমটা হাতে নিয়ে তিনি আবার কাজ শুরু করতে করতে বলেন, 'বেশ কিছুক্ষণ ধরে থানায় এসেছেন আপনি। আমার সামনে বসে কী একটা বলব বলব করেও বলছেন না। এবার বলুন তো, কেন এসেছেন?'

'আমি একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'ব্যাগ! সামান্য একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছেন আপনি, তার জন্য থানায় এসেছেন! আপনি জানেন, মানুষ কত রকম সমস্যা নিয়ে থানায় আসে?' মহিলাটি মুচকি হাসলেন।

'সম্ভবত গরুও আসে।'

'জি!' মহিলাটি আবার আমার দিকে তাকালেন, 'কী বললেন?'

'না, থানার এই ঘরের সামনে একটা গরু বাঁধা দেখলাম তো। শুনলাম, কী একটা ব্যাপারে নাকি গরুটাকে ধরে আনা হয়েছে।'

'অ, ওই কালচে গরুটার কথা বলছেন? রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া গরু, কার যেন কী ক্ষতি করেছে, ধরে এনে থানায় রেখে গেছে।'

'কোনো কেস হয়েছে নাকি গরুটার নামে?'

'ক্ষতিগ্রস্ত লোকটা করতে চেয়েছিল, আমরা নিইনি।'

'কেন?'

'মানুষের কেসই সামলাতে পারছি না, আবার গরুর কেস! এ রকম গরু-ছাগলের কেস নিলে আর কাজ শেষ করতে হবে না। ওই যে ফাইলের স্তূপ দেখছেন, ওগুলোর সবই কেসের ফাইল। আল্লাহ জানে, কবে ওই ফাইলগুলোতে হাত দেওয়া হবে, কবে ওগুলোর কাজ শেষ হবে!'

'ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের দেশে মানুষ এখনো গরু-ছাগলের নামে কেস করে!'

মহিলাটি গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের স্বভাবই হচ্ছে যেকোনো ব্যাপারে নিজের দেশকে, মানুষকে ছোট করে দেখা। খুবই খারাপ একটা স্বভাব। আপনি জানেন, উনিশ শ আটষট্টি সালে আমেরিকায় কী হয়েছিল? রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়া যাচ্ছিল, ওই রাস্তা দিয়ে কয়েকজন মানুষও যাচ্ছিল।

ঘোড়াটি হঠাৎ বিকট শব্দ করে একটা হাঁচি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে হাঁচির শব্দ শুনে একটি লোক ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায়, এতে তার তেমন কিছু হয় না, কেবল পরনের কাপড়গুলোতে ময়লা লেগে যায়। লোকটি তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়ে ঘোড়ার নামে কেস করে! ঘোড়ার মালিক পরে বিশ ডলার জরিমানা দিয়ে ঘোড়াটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি!'

'আপনি যদি বিলিভ ইট অর নট বইটা পড়েন, তাহলে এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন। আরো একটা কথা বলি আপনাকে। নিউইয়র্কে যদি পাঁচ মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ চলে যায়, আপনি কি জানেন ওই সময়টাতে কতগুলো মেয়ে রেপ্‌ড হয়ে যাবে?'

মাথা এদিক-ওদিক করলাম আমি।

'আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, কী ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাবে ওই সময়টাতে। আর আমাদের দেশে তো দিন-রাত মিলে কমপক্ষে চার-পাঁচবার বিদ্যুৎ যায়। কই, ওই সময়টাতে কয়টা রেপ হয়, কয়টা রেপের কথা শুনেছেন আপনি? শোনেন, আমাদের দেশের কিছু মানুষই আছে, যারা সবকিছুতেই নেগেটিভ ভাবে, নেগেটিভ চিন্তা করে, নেগেটিভ বলে। ডিসগাসটিং!'

শব্দ করে রুমের ভেতর ঢুকে একজন পুলিশ বললেন, 'ম্যাডাম, একটা ছিনতাইকারী ধরা হয়েছে।'

'কোন এলাকা থেকে?'

'এই মোহাম্মদপুর থেকেই।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

পুলিশটি চলে যেতেই আমি বললাম, 'ম্যাডাম, একটা অনুরোধ করব, জাস্ট একটা অনুরোধ।'

ভ্রূ উঁচু করে পুলিশ ম্যাডাম আমার দিকে তাকালেন। সাইড-টেবিলে ঢেকে রাখা চকচকে পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললেন, 'বলুন।'

'কিছুক্ষণ আগে যে পুলিশ ভদ্রলোকটি এখানে এসেছিলেন, আপনি কি তাকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করবেন, ছিনতাইকারীটিকে তারা ধরেছেন, না পাবলিক তাকে ধরে মার দেয়ার পর পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করছে?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় পাবলিক মার দেয়ার পর পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে, এরপর থানায় নিয়ে এসেছে।'

'পুলিশ সম্পর্কে আপনাদের এ ধারণা কেন?' কিছুটা রাগী গলায় বলেন

পুলিশ ম্যাডাম।

'না, এটা আমাদের ধারণা নয়। পেপার খুললেই সব সময় এ রকম কিছু দেখি তো।'

'আপনি কি মনে করেন, পেপারে যারা এ রকম কিছু লেখে, তারা ফেরেশতা? শোনেন, আমি এখন যেখানে বসে আছি, যে চেয়ারটাতে বসে আছি, সেখানে বসে অনেক সাংবাদিককে দেখা যায়। বাংলাদেশের কিছু সাংবাদিক আছেন, যারা ঘুষ ছাড়া কিছু বোঝেন না; কিছু সাংবাদিক আছেন, যারা কোনো কথা না বলেই সাক্ষাৎকার ছাপিয়ে ফেলেন। কিছু সাংবাদিক তো কথায় কথায় বুঝিয়ে দেন যে তিনি সাংবাদিক।' চেহারা রাগী রাগী করে বলেন পুলিশ ম্যাডাম।

'হ্যাঁ, এটাও আমি শুনেছি।'

'এ নিয়ে একটা রিউমারও আছে। রাস্তা দিয়ে একটা স্বাস্থ্যবান লোক হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটা রোগা-পাতলা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার। রোগা-পাতলা লোকটা পড়ে যান রাস্তায়। এ অবস্থায় স্বাস্থ্যবান লোকটা ওই লোকটাকে হাত ধরে টেনে তুলবেন কি, বরং চিৎকার করে বলেন, রাস্তায় দেখেশুনে চলতে পারিস না! জানিস, আমি কে? আমি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক।' পুলিশ ম্যাডাম হাসতে হাসতে বলেন, 'তখন রোগা-পাতলা ওই লোকটা ওই বিশিষ্ট সাংবাদিককে কী বলেছিলেন, জানেন?'

আমি ছোট্ট করে বলি, 'কী?'

'ওই রোগা-পাতলা লোকটা তখন বলেছিলেন, আমিও একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক।' পুলিশ ম্যাডাম আবার হাসতে হাসতে বলেন, 'কী বুঝলেন? আগে বলা হতো, দেশে কাক আর কবির অভাব নেই। এখন মনে হয়, সাংবাদিকেরও অভাব নেই। অলিগলিতে সাংবাদিক। সবচেয়ে হাসি লাগে কখন, জানেন? যখন সাংবাদিকরা তাদের গাড়িতে 'সাংবাদিক' শব্দটা লেখেন এবং সেটা এতই বড় করে লেখেন যে, গাড়ির চেয়ে 'সাংবাদিক' লেখাটাই দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় মনে হয়।' ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে পুলিশ ম্যাডাম বলেন, 'আপনার নাম জানা হয়নি এখনো।'

'দন্ত্যন রুহমান।'

'কী!'

আগের মতোই আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'দন্ত্যন রুহমান।'

'এটা কেমন নাম হলো!'

'নাম তো নামই ম্যাডাম।'

'নিশ্চয় এ নামটা আপনার বাবা-মা রাখেননি?'

'জি।'

'আপনি নিজেই রেখেছেন? তা এ রকম একটা উদ্ভট নাম রাখার শানে নুজুল কী?' পুলিশ ম্যাডাম আগ্রহী চোখে আমার দিকে তাকান।

'শানে নুজুল একটা আছে।'

'বলা যাবে?'

আমি একটু সোজা হয়ে বসে বলি, 'আমার নানার নাম ছিল নজির রহমান। তার মতো ভালো মানুষের নজির নাকি অত্র এলাকায় একটিও ছিল না। মা তার বাবার নাম অনুসারে আমার নামও রাখে নজির রহমান। কিন্তু একদিন আমি ভেবে দেখি, আমার মধ্যে আসলে ভালো মানুষের কিছুই নেই। আমার মধ্যে রাগ আছে, হিংসা আছে, ঈর্ষা আছে, লোভ আছে, লালসা আছে—ভালো মানুষের কোনো নজিরই নেই আমার মধ্যে। তাই একদিন নামটা পাল্টে ফেললাম।'

'কিন্তু দন্ত্যন রুহমান—দেশে এত নাম থাকতে এ ধরনের কেন?'

'মা যেহেতু নামটা নজির রেখেছিল, তাই সেটা সম্পূর্ণ না পাল্টিয়ে নজির-এর প্রথম অক্ষর 'ন'টা নিয়েছি। আর দেশে এখন বিপুলসংখ্যক রহমান টাইটেলধারী মানুষ আছেন। তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান, কেউ হয়েছেন রেহমান। নব্য লেখকদের মতো আমিও নিজের নামটা সম্পাদিত করে রহমানকে করেছি রুহমান। সবশেষে আমার নাম দাঁড়িয়েছে দন্ত্যন রুহমান। আপনি আমাকে দন্ত্যন বলে ডাকতে পারেন।'

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে পুলিশ ম্যাডাম বলেন, 'খারাপ না, নামটা ভালোই লাগছে।'

'খুব যে ভালো তা নয়, দন্ত্যন শুনে অনেকে ঠাট্টা করে বলে, দন্ত্যন মানে কী—নবাব, নওজোয়ান, না নচ্ছাড়?'

'আপনি কী বলেন?'

'কিছু বলি না, মুচকি মুচকি হাসি।'

'তা দন্ত্যন রুহমান, আপনি যে একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছেন, ওটা কি খুলে দেখেছেন?'

'না।'

'ব্যাগটা কত বড়?'

পাশ থেকে ব্যাগটা উঁচু করে ধরে বলি, 'এই যে ব্যাগটা।'

'বেশ বড়ই তো ব্যাগটা।' পুলিশ ম্যাডাম একটু ভেবে বলেন, 'আপনি একটা কাজ করুন। বাইরে কোথাও গিয়ে ব্যাগটা খুলে পরীক্ষা করুন, কোনো

নাম-ঠিকানা পেয়ে যেতে পারেন, তারপর সেই নাম-ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে দিন ব্যাগটা।'

'এখানে কিছু করা যাবে না?'

'যাবে না তা নয়, কিন্তু থানায় এর চেয়ে বড় বড় সমস্যা জড়ো হয়ে আছে। আমরা সেই সব সমস্যা সমাধান করতেই হিমশিম খাচ্ছি। এসব ছোটখাটো সমস্যার দিকে নজর দেয়ার সময় কই আমাদের। অ, ভালো কথা, চা খাবেন এক কাপ?'

'খাওয়া যায়। তবে আপনার কাজের কোনো ডিস্টার্ব হবে না তো?'

'ডিস্টার্ব যা করার করে ফেলেছেন আপনি।' পুলিশ ম্যাডাম হাসতে হাসতে বলেন, 'সাধারণত পুলিশের সামনে এসে সবাই কেমন যেন মিনমিন করে কথা বলে। কিন্তু প্রথম থেকেই আপনি বেশ স্মার্টলি কথা বলছেন। ব্যাপারটা ভালো লেগেছে আমার। সম্ভবত এই জন্যই আপনার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম আমি।'

'আপনার অনেক সময় নষ্ট হলো।'

'তা একটু হয়েছে।' পুলিশ ম্যাডাম হাসতে থাকেন।

উঠে দাঁড়াই আমি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ম্যাডাম বলেন, 'আপনার কোনো ফোন নাম্বার আছে?'

থানা থেকে বের হয়ে এলাম আমি। বাড়ি থেকে প্রতিবার পালানোর সময় আমি সাধারণত খালি-হাতে বের হই। কোনো ব্যাগ কিংবা এক্সট্রা কোনো জামা-কাপড়ও থাকে না আমার হাতে। তাই কুড়িয়ে পাওয়া এই ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেশ অস্বস্তি লাগছে হাঁটতে। ব্যাগটাও মাশাআল্লাহ বেশ ভারী। কী যে আছে এটার ভেতর, আল্লাহ জানে! খুলে যে দেখব, সেটাও দেখার ইচ্ছে হচ্ছে না। তবে নির্জন কোনো জায়গা পেলে খুলে দেখতে হবে এটা।

বাড়ি থেকে এ পর্যন্ত না হলেও দশবার পালিয়েছি আমি। তখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আমার খুব ভালো লাগে। সারা দিন, সারা রাত আমি হাঁটিও। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একদিন একটা মোবাইল ফোনসেট কুড়িয়ে পেয়েছিলাম রাস্তার পাশে। বাড়ি পালানোর পর ওটাই আমার প্রথম কোনো কিছু পাওয়া। তখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে জানতাম না। প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগায় এক হোটেলে খেয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমার পকেটে কোনো টাকা ছিল না। সেটটা তখন রেখে এসেছিলাম ওই হোটেল ম্যানেজারের কাছে, যদিও তিনি সেটটা রাখতে চাননি।

কয়েক মাস পর এক মহিলা ফোন করেন এ মোবাইল সেটে। স্বভাবতই ফোনটা রিসিভ করেন হোটেল ম্যানেজার সাত্তার ভাই। বেশ কয়েকবার এভাবে ফোন পাওয়ার পর তার সঙ্গে আমার একদিন দেখা। এরই মধ্যে সাত্তার ভাই ও তার পরিবারের সঙ্গে একটা সখ্য গড়ে উঠেছে আমার। আমি এখন সাত্তার ভাইকে ডাকি দুলাভাই, তার বউকে আপা। তিনি আমাকে পেয়েই বললেন, 'দন্ত্যন, ইদানীং একটা মহিলা ফোন করেন এ মোবাইল সেটে। সম্ভবত তোমার একবার কথা বলা উচিত তার সঙ্গে।'

সাত্তার ভাই সেটটা ফেরত দেন আমাকে। কদিন পর ওই মহিলা আমাকে ফোন করে অনেক কথা বলার পর বলেন, মোবাইল সেটটা তার। সঙ্গত কারণেই তার সঙ্গে দেখা করি আমি। আমাকে দেখেই মিষ্টি করে বললেন, 'ফোনে যে তুমি করে বলেছি তোমাকে, মাইন্ড করেছ?'

'তুমি করে বলাটাই কি উচিত নয়?'

'উচিত। কারণ নাও আই অ্যাম ফিফটি থ্রি।' মহিলা আবার হেসে উঠলেন। মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। তিনি যেমন মেপে হাসছেন, তেমনি মেপে মেপে কথাও বলছেন। কথা বলার সময় তার ঠোঁট দুটো নড়ছে কি নড়ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। কেবল বোঝা যাচ্ছে, তার ঠোঁট দুটো একটু রঙ করা, যতটুকু করলে কোনোক্রমেই সামান্য বাড়াবাড়ি মনে হয় না, ঠিক ততটুকু। ভ্রূ দুটো চিকন হয়ে বেঁকে গেছে, নাকটা তরতরে লম্বা, চোখ দুটো সব সময় হাসিময়। কেবল... কেবল তার মাথার চুলগুলো ছেলেদের চুলের মতো করে কাটা। আর একটা জিনিস ছেলেদের মতো। তার মাথার সামনের দিকের পুরোটা অংশ ছেলেদের মতো ফাঁকা ফাঁকা, কিছুটা টাকের মতো। এর পরও এ কথা আমি খুব নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তার মতো সুন্দরী মহিলা আমি খুব কমই দেখেছি।

পুরো দেড় ঘণ্টা একটা কফি হাউসে বসে গল্প করেছিলাম আমরা। মহিলার নাম জিনিয়া সামাদ। জার্মানিতে থাকেন। ডিভোর্স হয়ে গেছে, তবে আমার বয়সী একটা ছেলে আছে তার। বছরে একটা সময় তিনি দেশে আসেন। গতবার দেশে এসেই আমার কুড়িয়ে পাওয়া এই মোবাইল সেটটা কিনে রিকশায় করে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে একটা শপিং ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই ব্যাগের সঙ্গে একটা কাভারে আটকানো ছিল মোবাইল সেটটা। কোথা থেকে একটা ছেলে এসে তার হাত থেকে ব্যাগটা টান দিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালায়। মোবাইল সেটটা তখন ছিটকে কোথাও পড়ে যায়। ব্যাগের সঙ্গে যে একটা মোবাইল সেট আটকানো ছিল, সেটা হয়তো খেয়াল করে করেনি ছিনতাইকারী ছেলেটা, যা পরে আমি কুড়িয়ে পাই।

জিনিয়া সামাদ সেদিন রাতেই জার্মানিতে ফিরে যান। কেনার পর নতুন এই মোবাইল সেটের সিমের নাম্বার তিনি লিখে রেখেছিলেন একটা নোটবুকে। পরের বার দেশে ফিরেই কিছুটা কৌতূহল নিয়ে তিনি নাম্বারটাতে ফোন করেন এবং সাত্তার ভাইয়ের সাথে কথা হয় তার। পর্যায়ক্রমে কথা হয় আমার সাথেও। তারপর তার সাথে দেখা করে সেটটা দিয়ে দিই তাকে। কিন্তু সেটটা ফিরিয়ে দেন তিনি আমাকে। মাঝে মাঝেই তিনি জার্মানি থেকে ফোন করেন আমাকে এবং একটানা কথা বলেন বেশ কয়েক মিনিট।

দ্বিতীয়বার পেলাম এই ব্যাগটা। মোবাইল ফোনের তো একটা নাম্বার ছিল, কিন্তু ব্যাগের তো কোনো নাম্বার থাকে না। সুতরাং ব্যাগটা আপাতত ফেরত দেয়ার কোনো রাস্তাই দেখছি না। কী যে করি!

রাস্তা অবশ্য একটা আছে, ব্যাগটা খুলে ফেলা। কিন্তু ব্যাগটা খোলার তো কোনো জায়গাই পাচ্ছি না। একটা নিরিবিলি জায়গা দরকার। তারপর ব্যাগটার চেইনটা হয়তো খোলা যাবে। তবে চেইন খোলার কথা যখনই মাথায় আসে, তখনই মনে হয়, ব্যাগের ভেতর সম্ভবত শক্তিশালী কোনো বোমা আছে এবং চেইনটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোমাটা ফেটে যাবে। জটিল একটা সমস্যা সৃষ্টি করছে ব্যাগটা।

মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে হঠাৎ। পকেট থেকে বের করে রিসিভ করতেই এক মহিলা বললেন, 'ব্যাগটা খুলেছেন আপনি?'

গলাটা বেশ চেনা চেনা লাগছে। আমি বললাম, 'কে বলছেন?'

'আপনি কি দন্ত্যন রুহমান?'

'জি।'

'আমি নাজনীন, সাব-ইন্সপেক্টর নাজনীন, থানায় এসে যার সঙ্গে একটু আগে কথা বলে গেলেন।'

'ও, ম্যাডাম! না, ব্যাগটা এখনো খোলা হয়নি। আমি কি ব্যাগটা আপনার কাছে নিয়ে আসব?'

'না না, আমার কাছে আনার দরকার নেই। ব্যাগটা খুলে কী পেলেন, শুধু তা জানালেই চলবে।'

'জানানোটা কি জরুরি কিছু?'

'না, জাস্ট কৌতূহল।'

হাতে ধরা ব্যাগটার দিকে তাকালাম আমি। হ্যাঁ, আমারও এখন কৌতূহল হচ্ছে, কী আছে এই ব্যাগটার ভেতর!

দেশে অনেক **রহমান**
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন **রাহমান**,
কেউ হয়েছেন **রেহমান**,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন **রুহমান**!

দন্ত্যন রুহমান

সাত্তার ভাই আমাকে দেখেই বেশ রাগ নিয়ে বললেন, 'তুমি ইদানীং কোথায় থাকো বলো তো! তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে পাওয়া যায় না, তোমার ফোনও বন্ধ থাকে, তুমি তো দেখছি ভিআইপি হয়ে গেছ!'

'আপনার কি মনে হয় আমি ভিআইপি ধরনের কেউ না! শোনেন দুলাভাই, প্রত্যেকটা মানুষই তার নিজের কাছে নিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। কেউ তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবুক বা না-ভাবুক। আপনিও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দুলাভাই।' আমি একটু মোসাহেবি হাসি দিয়ে বলি, 'তা আমাকে খুঁজছিলেন কেন আপনি?'

'তার আগে বলো, তোমার মোবাইল বন্ধ কেন।'

'টাকা ছিল না।'

'টাকা ছিল না, না?' সাত্তার ভাই আগের মতোই রাগ হওয়া গলায় বলেন, 'তোমার মোবাইলে তো টাকা উপচে পড়ার কথা। কতজনই তো তোমার মোবাইলে টাকা পাঠায়। আমি টাকা পাঠাই, তোমার আপা টাকা পাঠায়। চৈতী নামের বড়লোকের একটা মেয়ে আছে না, সেও ফ্লেক্সি করে তোমাকে। তাহলে টাকা থাকে না কেন তোমার মোবাইলে?'

'ঠিক টাকা যে থাকে না তা নয়। মাঝে মাঝে ফোনটা বন্ধ রাখতে ইচ্ছে করে, তাই বন্ধ রাখি।'

'কেন?'

'কিছুক্ষণ পর পর মোবাইলের ঘ্যান ঘ্যান শব্দ, ভাল্-লাগে না। সবচেয়ে বেশি বিরক্ত লাগে, যখন মাঝরাতে ফোনটা বেজে ওঠে।'

'তোমাকে আবার মাঝরাতে ফোন করে কে?'

'আপনার কি মনে হয় মাঝরাতে কেউ আমাকে ফোন করতে পারে না?' সাত্তার ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাই আমি।

'মাঝরাতে সাধারণত কথা বলে চোর-বাটপার, বাজে লোকজন।'

'আপনি কি আমাকে ভালো মানুষ ভাবেন?'

'তোমাকে আমি কী ভাবি সেটা আমিই জানি। তোমার বোন কী একটা স্বাদের জিনিস রেঁধেছে। তোমাকে ছাড়া সে তা মুখে দেবে না। সেই জন্যই তোমাকে খোঁজা। যাও, একবার বাসায় গিয়ে দেখা করো, বকা কাকে বলে বুঝবে।' হোটেলে অনেক লোক বসে এটা-ওটা খাচ্ছে। সাত্তার ভাই টাকা নেয়া-দেয়ার কাজে ব্যস্ত হতে হতে বললেন, 'সারা দিন তো বোধহয় কিছু খাওনি, মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। আমার পাশের এই টুলটাতে বসো, কিছু মুখে দাও।' আমার সাথে কথা বলতে বলতেই সাত্তার ভাই মেসিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, 'বক্কার— ।' এরপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে একটা খানা দে।'

খুব গভীরভাবে আমি সাত্তার ভাইয়ের দিকে তাকালাম। খুব আপনজনের মতো তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন। অথচ তিনি আমার রক্তের কেউ নন।

বছর দেড়েক আগে একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। স্বভাবতই হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই, কিন্তু প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার। হোটেলে ঢুকে খাওয়াদাওয়া শেষ করে ম্যানেজার সাহেবকে ব্যাপারটা বলতেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'টাকা-পয়সা নাই তো খেলেন কেন?'

বেশ কিছু যুক্তি দেখালাম আমি। কিন্তু কোনো যুক্তিই তিনি কানে তুললেন না। শেষে আমি কিছুটা নরম স্বরে তাকে বললাম, 'যেহেতু আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, আপনিও আমাকে ছাড়বেন না, তাহলে দুটো কাজ করতে পারেন আপনি।'

ম্যানেজার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কী?'

কোনো রকম দ্বিধা না করে আমি বললাম, 'আমাকে দিয়ে আপনি আপনার হোটেলের এঁটো থালা-বাসনগুলো ধুইয়ে নিতে পারেন।'

ম্যানেজার সাহেব খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, 'পারবেন আপনি থালা-বাসন ধুতে?'

ধক্ করে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা। থালা-বাসন ধুতে বলবেন নাকি লোকটা! আতঙ্ক ভর করা চেহারা নিয়ে আমি নিজের প্রস্তাবটা উইথড্র করার জন্য বলি, 'এতে একটা অসুবিধা হতে পারে।'

'কী অসুবিধা?'

'কোনো দিন এসব কাজ করিনি তো। এ হোটেলের সব জিনিসই তো

দেখছি কাচের। হাত থেকে পড়ে গিয়ে জিনিসপত্র ভেঙে যেতে পারে।'

ম্যানেজার কী একটা ভেবে বললেন, 'আপনি দুটো কাজের কথা বলেছিলেন, দ্বিতীয় কাজটা কী?'

'দ্বিতীয় কাজটা হলো, আপনি আমাকে বেঁধে রাখতে পারেন।'

'বেঁধে রাখব!'

'জি।' হোটেলের সামনের একটা লাইটপোস্ট দেখিয়ে আমি ম্যানেজার সাহেবকে বলি, 'মোটা একটা রশি দিয়ে ওই লাইটপোস্টের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রাখতে পারেন। তাতে অনেকে আমার এ অবস্থা দেখে সবকিছু জেনে যাবে। তখন তারা করুণা করে দু-একটা করে টাকা ছুড়ে দিতে পারে আমার দিকে। একসময় বেশ কিছু টাকা জমা হবে। তারপর সেখান থেকে আপনার খাবারের দামটা হয়ে যেতে পারে। তবে এতে একটা অসুবিধা আছে—আমার আবার ঘন ঘন টয়লেট পায়। আপনি কিংবা আপনার কোনো লোক দিয়ে একটু পর পর রশি খুলে টয়লেটে নিয়ে যেতে হবে আমাকে, টয়লেট শেষে আবার এই লাইটপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে।'

'না না, এটা সম্ভব না।' বলেই তিনি আমার হাতের সোনালি ঘড়িটির দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'আপনি বরং এই ঘড়িটা রাখুন।' ম্যানেজার সাহেব ঘড়িটা রাখতে চান না। শেষে আমি অনেক কৌশল করে কুড়িয়ে পাওয়া ওই জিনিয়া সামাদের মোবাইল সেটটা রেখে যাই ম্যানেজার সাহেবের কাছে। আর এই ম্যানেজার সাহেবই হচ্ছেন সাত্তার ভাই। আমি এখন প্রায়ই তাদের বাসায় যাই, তার বউ শেপু ভাবিকে ডাকি আপা, তাদের একমাত্র সন্তান নিলয় আমাকে ডাকে মামা। কেবল ভার্সিটিতে পড়া শেপু আপার ছোট বোন কবিতার সঙ্গে আমার কেমন যেন একটা সম্পর্ক, আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

বক্কার প্লেট বোঝাই করে খাবার আনতেই আমি বললাম, 'কেমন আছ বক্কার?'

'ভালো।' খাবারের প্লেটটা সাত্তার ভাইয়ের সামনের ছোট টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বক্কার বলল, 'আপনি তো অনেক দিন পরে আইলেন দস্ত্যন ভাই।'

'হ্যাঁ, একটু কাজ ছিল।'

সাত্তার ভাই টাকা রাখার ড্রয়ারটা বন্ধ করে আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে কিছুটা শব্দ করে বললেন, 'কিরে বক্কার, কী খাবার দিয়েছিস! যা, একটা চিতল

মাছের বড় পেটি নিয়ে আয়।'

'দুলাভাই, বক্কার যা দিয়েছে তা-ই খেতে পারব না। ওই সব পেটি-টেটি লাগবে না।'

'আমার কাছে ভদ্রতা দেখাতে এসো না। আমি জানি তোমার বয়সী ছেলেরা কী খায়, কতটুকু খায়। বিশ-বাইশ বছর ধরে এই হোটেলে আছি। তা ছাড়া তোমার মতো বয়স একদিন আমারও ছিল। আরো একটা ব্যাপার, তোমার আপা যদি জানে তোমাকে একটা মাছ দিয়ে ভাত খেতে দিয়েছি আমি, তাহলে আস্ত রাখবে না আমাকে।'

বক্কার চিতল মাছের ইয়া বড় একটা পেটি এনে দিল আমার প্লেটে। তা দেখে সাত্তার ভাই বললেন, 'মুরগির মাংস খাবে?'

অবাক চোখে আমি সাত্তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন দুলাভাই!'

'পাগল তো আজ না, তোমার বোনকে বিয়ে করার পর থেকেই হয়েছি।' সাত্তার ভাই পাশে রাখা ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কার ব্যাগ?'

'জানি না।'

'কিন্তু তুমিই তো রাখলে এখানে।'

'হ্যাঁ, ব্যাগটা আমি এনেছি, কিন্তু কার ব্যাগ সেটা জানি না। কলাবাগানের একটা ডাস্টবিনের পাশে পড়ে ছিল ব্যাগটা।'

'ভেতরে কী আছে?'

'তাও জানি না।'

'খুলে দেখবে না! কার না কার ব্যাগ, কি না কি আছে! খুলে দেখার দরকার ছিল না!'

খাওয়া শেষ করে আমি বললাম, 'খুলতে ইচ্ছে করেনি। বাসায় গিয়ে খুলব। ব্যাগটা আপাতত এখানে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি। রাতে আপনি যখন বাসায় যাবেন, তখন আপনার সঙ্গে যাব আমি। একা একা এখন বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না।'

বেইলি রোডের মোড়ের কোনায় অনেকগুলো মানুষ জড়ো হয়ে আছে গোল হয়ে। উৎসুক হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম আমি সেদিকে। ভিড় ঠেলে একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, একটা লোক হাসি হাসি চেহারা করে কী যেন বলছেন, সবাই আগ্রহ নিয়ে তা শুনছে।

আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। লোকটা একটু করে কথা বলছেন আর একটু করে থামছেন। সবার মাঝে একটা আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য তিনি এ রকম করছেন। তারপর সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে এবার আসল গল্পটা শুরু করব আমি। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আমাকে।'

'আপনি যে গল্পটা বলবেন সেটা কতটুকু সত্য?' পাশ থেকে একজন একটু এগিয়ে এসে বলল।

'মিথ্যা গল্প বলে আমি আমার জীবন চালাই না ভাইজান। মিথ্যা আমি বলতে পারি না। আমি যে গল্পটা বলব, সেটা সম্পূর্ণ সত্য, দিনের সূর্যের মতো সত্য। আপনারা আমার এই গল্প শুনে দু-একটা করে টাকা দেবেন, তা দিয়ে আমি আমার, আমার পরিবারের সবার জীবন চালাব। জীবন চালাতে হয় হালাল জিনিস দিয়ে, হারাম বড় খারাপ জিনিস ভাইজান।'

'ঠিক আছে, আপনি শুরু করুন।'

লোকটা আবার চারপাশে তাকালেন। সবার অবস্থান বুঝে খুক্ করে একটা কাশি দিয়ে শুরু করলেন, 'প্রথমেই আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার নাম বাশার আলী। আজ আমি যে মানুষটার গল্প বলব, সেই মানুষটার একটা চোখ ছিল না।'

'চোখ ছিল না মানে কী?' ওই লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'একটা চোখ অন্ধ তার।'

'ওটা কি জন্ম থেকেই অন্ধ, না জন্মের পর অন্ধ হইছে?'

'সেটা এখনই বলতে চাই না। গল্প বলতে বলতে ব্যাপারটা এসে যাবে।' বাশার আলী একটু থেমে বললেন, 'আমি যে লোকটার গল্প বলছি, তার নাম মনতাজ মিয়া। মনতাজ মিয়া দিনে কোনো কাজ করত না।'

'চোর ছিল নাকি সে?' পাশ থেকে আরেকজন জিজ্ঞেস করল।

'চোর হবে কেন।'

'ওই যে বললেন দিনে কাজ করত না, তার মানে তো রাতে কাজ করত। রাতে তো কাজ করে চোরেরা।'

'না ভাই, রাতে শুধু চোরেরাই কাজ করে না। রাতে পাহারাদারেরা কাজ করেন, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন, ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করে, অনেক ডাক্তার-নার্স হাসপাতালে রোগীদের সেবা করেন, আরো অনেকে অনেক কিছু করেন। মনতাজ মিয়া করত মাছ ধরার কাজ। সে সারা রাত নদীর কিনার

দিয়ে হেঁটে বেড়াত আর মাছ ধরত। আপনারা অনেকে জানেন, রাতে অনেক মাছ নদী কিংবা পুকুরের কিনারে এসে ঠাঁই নেয়।' বাশার আলী সবার দিকে ফিরে তাকালেন আবার। বেশ লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। মুখটা আগের চেয়ে হাসি হাসি হয়ে গেল তার।

'নদীতে মাছ ধরার সঙ্গে মনতাজ মিয়ার চোখের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?' আরেকজন জিজ্ঞেস করল।

'জি, আপনি ঠিক ধরেছেন।' লোকটার দিকে তাকিয়ে বাশার আলী বললেন, 'মনতাজ মিয়া একদিন আধাপূর্ণিমার রাতে মাছ ধরতে গেছে নদীতে। রাত তখন তিনটা। সুনসান রাত, আশপাশে কেউ নাই। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, মনতাজ মিয়া, তোমার চোখ দুটা তো সুন্দর!

কিছুটা চমকে উঠে মনতাজ মিয়া বলল, কে, কে কথা কয়?

আমি।

মনতাজ মিয়া আগের চেয়ে চমকে উঠে বলল, আমি কে?

সামনের দিকে তাকাও।

মনতাজ মিয়া সামনের দিকে তাকাতেই দেখে, অসাধারণ রূপবতী একটা মেয়ে ভেসে আছে নদীর কিনারায়। মাথায় ইয়া লম্বা চুল, চুলগুলা বুকের সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয়া; টানা টানা চোখ; হাত দুটা সাদা ধবধবে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে মেয়েটা। কিন্তু একটু পর ভালো করে তাকাতেই সে দেখে, মেয়েটার নিচের অংশ, অর্থাৎ কোমর থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাছের মতো!'

'ওটা তো তাহলে মৎস্যকন্যা না কী যেন একটা বলে, সেটা!' পাশ থেকে আগের লোকটা বলে।

'তা তো বলতে পারব না ভাইজান।' বাশার আলী খুব বিনয়ী হয়ে বলেন, 'আল্লাহ পাকই জানেন, ওটা কী ছিল?'

'তারপর কী হলো, বলেন?' আরেকজন বেশ উৎসাহী হয়ে বলল।

'মাছের মতো মেয়েটা মনতাজ মিয়াকে বলল, তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে আমার।

মনতাজ মিয়া ভয় ভয় গলায় বলল, কী?

তুমি তোমার একটা চোখ আমাকে দিয়ে দাও।

চমকে উঠে মনতাজ মিয়া বলল, চোখ দেব কীভাবে আমি!

তুমি তোমার একটা হাত চোখের কাছে রাখলেই চোখটা তোমার হাতে

এসে পড়বে। তারপর চোখটা আমাকে দিয়ে দেবে।

বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর মনতাজ মিয়া বলল, আমার চোখ কেন আমি তোমাকে দেব?

তোমার বিরাট একটা উপকার হবে তাতে।

কী উপকার হবে?

সেটা তো এখন বলব না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমার একটা চোখ আমাকে দাও। তারপর দেখো, তোমার কী উপকার হয়।

ধন্ধে পড়ে যায় মনতাজ মিয়া। মাছের মতো মেয়েটা আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায় মেয়েটার ওপর। বুকের ভেতরটাও কেমন যেন করে ওঠে তার। সে আর কোনো কিছু না ভেবে তার একটা হাত চোখের কাছে নিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ একটা চোখ খসে এসে তার হাতে পড়ে। মনতাজ মিয়া তখন তার চোখটা মেয়েটার হাতে দিয়ে দেয়। চোখটা হাতে নিয়ে মেয়েটা আর কিছু বলে না, মুচকি একটা হাসি দিয়ে চলে যায় পানির নিচে।' বাশার আলী আবার সবার দিকে তাকান।

'মনতাজ মিয়ার কি কোনো উপকার হইছিল, না সবকিছু ভাঁওতাবাজি ছিল।' আরেকজন বলে কথাটা।

'ভাঁওতাবাজি না, মনতাজ মিয়ার উপকার হইছিল, বিশাল উপকার।' বাশার আলী সবার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকিয়ে বলেন, 'উপকার কী হইছিল সেইটা এখন আপনাদের বলব আমি। তার আগে একটা কথা। যদি আমার এই সত্য কাহিনীটা আপনাদের ভালো লাগে, তবে গল্প শেষে চলে যাওয়ার সময় দু-একটা করে টাকা আমাকে দিয়ে যেতে ভুলবেন না।'

মুগ্ধ হয়ে আমি বাশার আলীর গল্পটা শুনছিলাম। কী চমৎকারভাবে গল্প বলছেন তিনি, আর সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনছে। পকেটে এই মুহূর্তে বেশ কিছু টাকা আছে আমার। সেখান থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে আমি বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। তিনি সেটা হাতে না দিয়ে ছুড়ে দিতে বললেন ইশারায়। টাকাটা ছুড়ে দিলাম আমি। বাশার আলীর পায়ের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় টাকাটা গিয়ে পড়ল। সঙ্গে আরো কয়েকজন টাকা ছুড়ে দিল। বেশির ভাগই দুই টাকার নোট, একজন অবশ্য একটা পাঁচ টাকার নোট ছুড়ে দিয়েছে।

টাকাগুলো সেভাবেই রেখে বাশার আলী বললেন, 'মনতাজ মিয়া হঠাৎ খেয়াল করে, যে চোখটা সে মাছের মতো মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে, সেই

চোখের জায়গা দিয়ে একটা আলো বের হচ্ছে। কেমন যেন নীলচে একটা আলো। আলোটা নদীর কিনারায় পানিতে পড়তেই সে আবার চমকে উঠল। নীলচে সেই আলোর আকর্ষণে হাজার হাজার ছোট-বড় মাছ এসে হাজির। সব মাছই কেমন যেন স্থির, একদম নড়াচড়া করতেছে না।

কিছুটা ভয় নিয়ে মনতাজ মিয়া পানিতে হাত দেয়। মাছগুলা আগের মতোই স্থির হয়ে থাকে, ভয় পেয়ে সরে যায় না। কপাল খুলে যায় মনতাজ মিয়ার। এর পর থেকে প্রতি রাতে চোখের নীলচে আলোতে ঝুড়ি বোঝাই করে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতে থাকে সে। মনতাজ মিয়া এখন বিশাল ধনী। তার এখন বাড়ি হইছে, জমিজমা হইছে, চাকর-বাকর হইছে।'

কাহিনী শেষ করে বাশার আলী সবার দিকে আবার তাকান। আরো কিছু টাকা এসে পড়ে ফাঁকা জায়গাটায়। একটু পর সবাই চলে যায়, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে থাকি আগের মতোই। টাকাগুলো কুড়াতে কুড়াতে বাশার আলী আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিছু বলবেন?'

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, 'জি।'

টাকা কুড়ানো শেষ করে বাশার আলী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বলুন।'

'এতক্ষণ তো আপনি মনতাজ মিয়ার গল্প বললেন। এবার আমি আপনার গল্প শুনতে চাই।' মুখটা হাসি হাসি করে বললাম আমি।

'আমার গল্প আর কী বলব আমি!' মাথাটা নিচু করে ফেলেন বাশার আলী। আমি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ওনার একটা হাত ধরে বলি, 'প্রত্যেকেরই একটা গল্প আছে, জীবনের গল্প, বেঁচে থাকার গল্প, টিকে থাকার গল্প। আমি সেই গল্পটা শুনতে চাই।' আমি একটু থেমে বলি, 'আপনি এত চমৎকার করে কতগুলো গল্প বানিয়েছেন?'

বাশার আলী মাথাটা একবার উঁচু করে আবার নিচু করে ফেলেন। আমি মুখটা আরো হাসি হাসি করে বলি, 'আমি জানি, আপনার ওই গল্পটা সত্য না, বানানো। এতে লজ্জার কিছু নেই। বেঁচে থাকার জন্য আমরা অনেক কিছুই করি। চুরি করি, ঘুষ খাই, অন্যের ক্ষতি করি, অন্যের অন্যায় মেনে নিই, মঞ্চে উঠে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই, আরো কত কি করি! এসবের কাছে আপনার গল্প-বলা তেমন কিছু না। আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করছে, এত কিছু থাকতে আপনি এই গল্প-বলাটা বেছে নিলেন কেন?'

'সম্ভবত আমি অন্য আর কিছু পারি না। এই ঢাকা শহরে এসে অনেক চাকরি খুঁজেছি, গার্মেন্টসে একটা পেয়েছিলামও। কয় দিন করার পর দেখি,

দম বন্ধ হয়ে আসে, কেমন যেন বন্দী বন্দী লাগে। অগত্যা— ।' কথা শেষ করেন না বাশার আলী।

'আপনার ভালো লাগে এইভাবে গল্প বলতে?'

'না। প্রতিবার ভাবি এ কাজটাও বাদ দিমু, কিন্তু এ কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই বাবার মুখটা ভেসে ওঠে। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমার হাত চেপে ধরে বলছিলেন, আমি যেন ছোট দুই ভাই আর বোন দুটাকে দেখি। প্রতি মাসে যতটুকু পারি, ওদের জন্য টাকা পাঠাই। ওদের দেখার জন্যই আজ চার বছর ধরে এই ঢাকা শহরে, বাড়ি যাওয়া হয় নাই এ চার বছরে। যাওয়া-আসার যা খরচ হইব, তাতে একজনের লেখাপড়ার খরচ চলব এক মাস, এই ভয়ে আর বাড়ি যাওয়া হয় না।'

'খারাপ লাগে না?'

'খারাপ লাগতে লাগতে এখন আর কোনো কিছুই খারাপ লাগে না।'

'রাতে কোথায় থাকেন আপনি?'

'চানখাঁরপুলে, একটা মেসে।'

'খাওয়াদাওয়া?'

'সকালে নাশতা করি, আর বিকালে এক কাপ চায়ের সঙ্গে দুটা বিস্কুট খাই। ব্যস, চলে যায়।'

'আপনাকে আরো একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দেব আমি, আপনি আমাকে আরো একটা এমন গল্প শোনাবেন, যেন তিন রাত আমার কোনো ঘুম না হয়। আছে আপনার কাছে এমন গল্প?'

বাশার আলী হাসতে হাসতে বলেন, 'আছে।'

'চলেন, তার আগে কোথাও গিয়া বসি।'

সাত্তার ভাইয়ের হোটেলে ঢুকে একটা টেবিলে বসলাম আমরা। তারপর বক্কারকে ডেকে খাবার দিতে বললাম একজনের জন্য। খুব দ্রুত খাবার নিয়ে এলো বক্কার। বাশার আলীকে খেতে বলতেই তিনি হাত না ধুয়েই খাওয়া শুরু করলেন। একটু পর খেয়াল করি, বাশার আলী কাঁদছেন। তার চোখের পানিগুলো টপ টপ করে তার হাতের ভাতে পড়ছে, সেই ভাতগুলো তিনি আবার খাচ্ছেন। ভাত খাওয়া একসময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু বাশার আলীর কান্না আর শেষ হয় না।

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দন্ত্যন রুহমান

গেট দিয়ে ঢুকতে নিতেই থমকে দাঁড়ালেন লোকটি। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। চশমাটা তার নাকের ওপর নেমে এসেছে, তিনি সেটা একটু উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, 'হু আর ইউ?'

বিচ্ছিরি একটা গন্ধ বের হচ্ছে লোকটার মুখ দিয়ে। খেয়ে এসেছেন, একেবারে লোড হয়ে এসেছেন তিনি। শুধু পেট লোড করেননি, আলাজিহ্বা পর্যন্ত লোড করে এনেছেন। একটু একটু টলছেনও। আমার মনে হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যাবেন তিনি।

'এই, এই স্টুপিড, আমি তোমাকে বললাম না, হু আর ইউ?'

'জি, আমার নাম দন্ত্যন, দন্ত্যন রুহমান।'

'কী! দন... দন...।' তোতলাতে থাকেন তিনি।

'দন্ত্যন রুহমান।'

'এটা কী ধরনের নাম হলো! নামের একটা ছিরি থাকা উচিত। ডোন্ট টেল মি এ লাই। তুমি সত্য কথা বলছ তো? তোমার নাম দন্ত্যনই তো? না, হাংকি-পাংকি নাম বলে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছ। শোনো, তুমি আবার ভেব না আমি মদ-টদ খেয়ে একেবারে মাতাল হয়ে গেছি। নেভার, আমি কখনো মাতাল হই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মদ মানুষকে খায়, আর আমি মদকে খাই। কী, ক্লিয়ার?' লোকটা টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।

'জি, ক্লিয়ার।'

'গুড, ভেরি গুড। তা তোমার নামটা যেন কী বললে?'

'দন্ত্যন, দন্ত্যন রুহমান।'

'গুড। দন... দন...।'

'দন্ত্যন রুহমান।'

'ও ইয়েস, দন্ত্যন রুহমান। আমার নাম প্রদীপ চৌধুরী। প্রদীপ মানে কী,

জানো তো?'

'জি, প্রদীপ মানে আলো।'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড...।' বলতে বলতে লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর আমাকে চুমু দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলেন, 'ইন্টেলিজেন্ট বয়। আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ...।'

গলার কাছে বমি চলে এসেছে আমার। মদের গন্ধ এর আগেও নাকে এসেছে, কিন্তু এ রকম গন্ধ কখনো নাকে আসেনি আমার। দুর্গন্ধের একটা সীমা আছে, আজকের গন্ধের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। রাস্তায় পড়ে পচে থাকা মরা কুকুরের গন্ধও এর চেয়ে ভালো।

লোকটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'শোনো ইয়াং ম্যান। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, এই ইন দ্য ইয়ার অব সিক্সটি-ফোর, তখন আমাদের ক্লাসের এক মৌলভি স্যার আমার নাম শুনে আমাকে বলেছিলেন, প্রদীপ হচ্ছে হিন্দুয়ানি নাম, এ নামটা রাখা নাকি ঠিক হয়নি। আমি তখন কী বলেছিলাম জানো? আমি বলেছিলাম, হুজুর, প্রদীপকে আরেক শব্দে কী বলা হয় জানেন? মৌলভি স্যার বলেন, কী? আমি বলি, চেরাগ। বাংলাদেশে অনেক মানুষের নাম আছে চেরাগ আলী। এবার আপনিই বলুন, প্রদীপ যদি হিন্দুয়ানি নাম হয়, চেরাগ আলী তাহলে কী?'

'মৌলভি স্যার কী উত্তর দিয়েছিলেন?'

'কী উত্তর দেবেন! ওই সব হুজুর-টুজুর কিছু জানেন নাকি! তারা শুধু জানেন, কার বাড়ি গিয়ে মুরগির ঠ্যাং দিয়ে ভাত খাওয়া যাবে। অথচ আমাদের ডিয়ার প্রোফেট কী বলেছেন, তিনি বলেছেন, শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীনে যাও। তারা চীনে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘর থেকেই বের হতে চান না। বাই দ্য বাই, তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি, তোমাকে দেখলাম গেট দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছ তুমি, আমাকে দেখে সরে দাঁড়ালে, এ বাসার কাউকে চেনো নাকি তুমি?'

'জি। চৈতীকে চিনি।'

'চৈতীকে চেনো!' কপাল কুঁচকে লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'চৈতী তোমার কে হয়?'

'কেউ না।'

'কেউ না! কেউ না তো এই রাত করে বাসায় আসার কী দরকার?'

'না, দরকার আমার নেই, দরকার সম্ভবত চৈতীর। ও আমাকে ফোন করে

আসতে বলেছে। তাই এসেছি।'

'ফোন করে আসতে বলল আর চলে এলে! তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় কীভাবে?' লোকটা এ মুহূর্তে একটু বেশি টলছেন।

'সে এক বিরাট ইতিহাস।'

'ইতিহাস! কিসের ইতিহাস?'

'এই যে আপনি আমার সঙ্গে মদ খেয়ে কথা বলছেন, আপনার মুখ দিয়ে বগবগ করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে, একটু পর এটাও ইতিহাস হয়ে যাবে। ইতিহাস হচ্ছে অতীতের কিছু ঘটনা।'

বেশ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে লোকটা তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তিনি আগে থেকেই কাঁপছিলেন, এ মুহূর্তে আরো বেশি কাঁপছেন। হঠাৎ তিনি আমাকে জাপটে ধরে বললেন, 'ইউ রাসক্‌ল্‌, আমি মদ খেয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছি, আমার মুখ দিয়ে বগবগ করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে! ডার্টি ম্যাড, চাপকে আজ তোর পিঠের চামড়া তুলে ফেলব। তারপর সেই চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাব। জানিস, চৈতী আমার কে হয়? আমি চৈতীর বড় খালু— ।' আমাকে ছেড়ে দিয়ে দু হাত দু দিকে প্রসারিত করে বলেন, 'বিগ খালু। ডু ইউ নো, কদিন পর চৈতীর মাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি?'

'না খালুজান, জানতাম না তো। এটা তো বড়ই সুসংবাদ।'

'অবশ্যই সুসংবাদ। কিন্তু পাশাপাশি একটা দুঃসংবাদও আছে।'

'কিসের দুঃসংবাদ খালু?'

'চৈতীর মা আমাকে বিয়ে করতে চায় না।'

'এটা কী বললেন খালুজান! আপনাকে বিয়ে করতে চান না, এটা একটা কথা হলো! আপনার মতো সুপাত্র এ তল্লাটে ক'জন আছে!' বেশ আফসোসের সুরে বলি আমি।

'যাক, তুমি অন্তত আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছ। আমার ইয়া দামড়ার মতো দু ছেলে আর সারাক্ষণ ফ্যাশন করা মেয়েও সেটা বুঝতে চায় না। বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল বউটা মারা গেছে। ওরা বুঝতে চায় না, আমার একটা বউ দরকার। ওরা ভাবে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। অল আর স্টুপিড। ওরা শুধু আমার বাইরেরটাই দেখল, ভেতরেরটা দেখল না। আমি যে এখনো টুয়েন্টি ফাইভ এজের পাওয়ার ক্যারি করি, ওরা সেটা জানে না।' আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বাসার দিকে এগোচ্ছেন। কিন্তু সিঁড়িতে পা রেখেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। পকেটে হাত দিয়ে একটা প্যাকেট বের করে বললেন, 'এই যে

দেখো, আমি সেই কবে থেকে এই হীরার আংটিটা পকেটে নিয়ে ঘুরছি। কবে যে চৈতীর মা, আই মিন আমার সদ্য বিধবা এই একমাত্র শ্যালিকাকে আমি রাজি করাতে পারব! তুমি দেখে নিয়ো, আমি একদিন ঠিকই রাজি করাব ওকে। রজকিনীর জন্য চণ্ডীদাস বারো বছর বড়শি বেয়েছিল, আমি এক শ বারো বছর এই আংটিটা পকেটে নিয়ে ঘুরব। হা হা হা...।' খালুজান হাসতে হাসতে সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়েন। দারোয়ান দৌড়ে এসে জাপটে ধরে খালুজানকে। আমি এই ফাঁকে দোতলায় উঠে আসি।

দরজায় চৈতী দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই মুখটা গম্ভীর করে বলল, 'খুব মজা পেয়েছ, না?'

'ব্যাপারটা কি মজার? একজন ডিজঅর্ডার্‌ড মানুষ, এ অবস্থায় মানুষ অনেক কিছুই করে। আমি অনেককে দেখেছি গায়ের জামা-কাপড় খুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে, একে-ওকে গালিগালাজ করতে।'

'বড় খালু তোমাকে কোনো গালিগালাজ করেননি তো?'

'যা-ই করুক, আমি কিছুই মনে করিনি।'

'মহামানব!'

'আমরা প্রত্যেকেই কমবেশি মহামানব।'

'আসো, ভেতরে আসো।'

চৈতীদের ড্রয়িং রুমে আমি কখনো বসিনি, বসতে আমাকে দেয়া হয়নি। বাসার ভেতর ঢুকলেই চৈতী সোজা আমাকে ওর রুমে নিয়ে যায়। দ্বিধা এখানে অর্থহীন, সংকোচ এখানে বাতুলতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা কথা বলি, গল্প করি, খুনসুটি করি। পাপহীন আমাদের এই সময়টা বয়ে যায় অবলীলায়, নিঃসংকোচে। মাঝে মাঝে চৈতীর মা এসে ঢোকেন রুমে, সেটাও কোনো কিছু জানান না-দিয়ে। সম্ভবত তিনি তার মেয়েকে চেনেন। আর নিজের সন্তানকে চিনলে অন্যকে চেনার দরকার হয় না।

'তোমার সঙ্গে আমার কত দিন পর দেখা হলো?'

'মনে নেই।'

'অথচ তুমি আমাকে একটা কথা দিয়েছিলে।'

'সপ্তাহে একবার হলেও তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'ইয়েস।'

'আমি কথা রাখতে পারিনি। কারণ আমরা স্রষ্টার মতো নির্ভীক নই, প্রকৃতির মতো সরল নই, নদীর মতো ভরাট নই, ঘাসের মতো সহনীয় নই।

ভালো কথা, আমাকে ফোন করেছ কেন তুমি?'

'দুটো কারণে। একটা কারণ হচ্ছে, অনেক দিন তোমাকে দেখি না, আরেকটা কারণ— ।' চৈতী একটু থেমে বলে, 'না, এ কারণটা তোমাকে কোনো দিন বলা হবে না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমি আমাকে ভুলে যাও, একেবারেই মনে থাকে না আমার কথা তোমার। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কীভাবে?'

'স্পষ্ট মনে আছে। কয়েকটা ছেলে একটা বাজি ধরেছিল—তোমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারলেই এক শ টাকা দেবে ওরা। তোমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলার পর তুমি ব্যাপারটা জানতেই মস্ত বড় একটা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলে আমাকে, খাওয়াতে। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না। কী, মনে আছে আমার? ভালো কথা, একটা গল্প শুনবে?' চৈতীর দিকে তাকাই আমি।

'কিসের গল্প?'

'অদ্ভুত একটা গল্প।'

'বলো।'

'মতলবপুর নামে একটা গ্রাম আছে। তিন মাস আগে ওই গ্রামে একটা লোক মারা যায়। লোকটার নাম বিনয় মজুমদার। গ্রামের লোকজন জানাজা পড়িয়ে লোকটাকে কবর দিয়ে আসে কবরস্থানে।'

'লোকটা মুসলমান ছিল?' চৈতী জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, মুসলমান ছিল। এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'না, আমি ভেবেছিলাম লোকটা হিন্দু ছিল। বিনয়-টিনয় নাম তো সাধারণত হিন্দুদেরই হয়। ঠিক আছে, তারপর বলো।' চৈতী বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে গল্পটার প্রতি।

'সারা দিন কেঁদেকেটে লোকটার বউ ঘুমিয়েছে। মাঝরাতের দিকে দরজায় টোকা দিয়ে কে যেন বলে, মদিনার মাও, দরজা খোলো। মদিনা হচ্ছে লোকটার মেয়ের নাম। মদিনার মা প্রথম ভেবেছিল সে ভুল শুনেছে। কিন্তু কয়েকবার ডাকটা শোনার পর সে কৌতূহলী হয়ে দরজা খুলেই চিৎকার দিয়ে ওঠে। মদিনার বাপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে যায়। কী ব্যাপার, বিকেলবেলা কবর দিয়ে আসা হয়েছে মদিনার বাপকে, রাতে এসে সে হাজির!

মুরব্বিরা সিদ্ধান্ত নেন, রাতেই কবরটা খোঁড়া হবে। মসজিদের ইমামকে

সাথে নিয়ে সারা গ্রামের লোকজন জড়ো হয় কবরস্থানে। কয়েকজন উৎসাহী হয়ে কবর খোঁড়া শুরু করে। কবর খোঁড়া শেষে দেখে, লাশটা ঠিকই আছে, আর কাফনের কাপড়ে মোড়ানো যে লাশটা, সেটা মদিনার বাপেরই।'

'এটা কীভাবে সম্ভব?' চৈতী চোখ বড় বড় করে ফেলেছে।

'আমারও প্রশ্ন, এটা কীভাবে সম্ভব!'

'গল্পের শেষটুকু তোমার জানা নেই?'

'না।'

'কেন?'

চৈতীর এ প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারি না আমি। বাশার আলী আমাকে যতটুকু বলেছেন, আমি ঠিক ততটুকুই বলেছি। চৈতীর দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে বলি, 'যদি তোমাকে এ রকম একটা করে গল্প প্রতিদিন কেউ শোনায়, তোমার কেমন লাগবে, বলো তো?'

'খারাপ না। ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

'একদিন একজন মানুষকে তোমার কাছে নিয়ে আসব। তারপর তোমাকে একটা অনুরোধ করব।'

'তুমি করবে আমাকে অনুরোধ!'

'আমার জন্য না, অন্যের জন্য।'

'যত কঠিনই হোক, তোমার সেই অনুরোধটা আমি রাখব। প্রমিজ!' চৈতী হাসতে হাসতে বলে। অন্য রকম হাসি ওর মুখে।

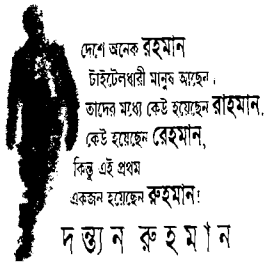

চোখ দুটো বড় বড় করে সাত্তার ভাই বললেন, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ! এখনো তো তোমার ফোনটা বন্ধ। চলো চলো, বাসায় যেতে হবে।'

'আপনি তো রাতে এত তাড়াতাড়ি বাসায় যান না দুলাভাই!'

'কী জানি একটা সমস্যা হয়েছে। তোমার বোন ফোনের পর ফোন করে অস্থির করে ফেলেছে আমাকে।'

'কী সমস্যা?'

'সেটা তো বলে নাই। বাসায় গেলে নাকি তারপর বলবে। তোমার কথা শুনে আরো তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে বলেছে। সমস্যাটার নাকি তুমি একটা সমাধান বের করতে পারবে।'

'আমি পারব!'

'তোমার বোনের সেটাই বিশ্বাস।'

'তাই নাকি!'

'আমিও একটু-আধটু বিশ্বাস করি।'

হাসতে হাসতে আমি বলি, 'একটু-আধটু কেন, পুরোটা নয় কেন?'

'না, এমনি।' সাত্তার ভাই পাশ থেকে ওই কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বলেন, 'আর কোনো কাজ আছে তোমার?'

'না, আর কোনো কাজ নেই। এখন সরাসরি বাসায় যাব। গোসল করতে হবে। সারা শরীর বালিতে কিচকিচ করছে!'

'একটু বসো। আমি হিসাবটা মিলিয়ে নিই।'

খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেছি, পরিচিত অনেকেই ইদানীং বিশ্বাস করে, আমার দ্বারা যেকোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব, তা যত জটিলই হোক। সবচেয়ে অবাক লাগে, যখন বাবার মাঝেও এই বিশ্বাসটা দেখি! সংসার মানেই জটিলতা, আর যখনই কোনো জটিল পরিস্থিতি এসে উপস্থিত হয়

আমাদের সংসারে, বাবা নির্ভার হয়ে তখন বলেন, বাবা নজির, দেখ তো বাবা, একটা গিট্টু লেগে গেছে, ছাড়া তো দেখি। বাবার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান বের করার পথ খুঁজে ফিরি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমি সফল হই। বাবার বিশ্বাসটা বেড়ে যায় আরো। বাবা আরো বেশি করে ডাকতে থাকেন, বাবা নজির..., বাবা নজির...।

সাত্তার ভাইয়ের বাসায় যেদিন প্রথম যাই, সেদিনই একটা সমস্যার সম্মুখীন হই আমি। সমস্যাটা আমার না, নিলয়ের। নিলয় হচ্ছে সাত্তার ভাইয়ের ছেলে, একমাত্র ছেলে। ক্লাস সিক্সে পড়ত তখন। বাসার গেটটা খুলেই একটা মেয়ে ফিসফিস বলল, 'খারাপ একটা খবর আছে, দুলাভাই!'

মেয়েটার নাম কবিতা, সাত্তার ভাইয়ের শ্যালিকা। চোখ দুটো বড় বড় করে তিনি কবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব খারাপ!'

'জি, খুব। আপার মাথাও গরম হয়ে গেছে খুব। আপনি পোড়া বেগুনের ভর্তা খেতে পছন্দ করেন না, আপনি যদি আপার মাথার ওপর আস্ত একটা বেগুন রাখেন এখন, একটু পর দেখবেন সেটা পুড়ে সেদ্ধ হয়ে গেছে।'

'ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার আগেরটাই।'

'আগেরটাই মানে?'

'নিলয় ফেল করেছে।'

'আবারও!'

কবিতা মুখ বাঁকা করে বলল, 'হুঁ, আবারও।'

'ওকে না দুইটা মাস্টার রেখে দিলাম?'

'দুইটা কেন দুলাভাই, ওকে একশটা মাস্টার শিল-পাটা দিয়ে বেটে খাওয়ালেও ও পাস করতে পারবে না।'

সাত্তার ভাই চেহারাটা হতাশ করে বলেন, 'আমার আর কী করার আছে বলো তো!'

'আপাতত কিছু করার নাই, আপনি এখন আপার মাথা ঠান্ডা করেন। এরই মধ্যে দুইটা কাচের গ্লাস আর একটা প্লেট ভাঙা হয়ে গেছে।'

'নিলয়কে মেরেছে নাকি?'

'আবার জিগায়!' কবিতা হাসতে হাসতে বলে, 'আধঘণ্টা পেটানোর পর ওকে এখন বাথরুমে আটকে রেখেছে।'

'সর্বনাশ! বলো কি!'

'প্লিজ দুলাভাই, বাসায় ঢুকেই নিলয়কে বাথরুম থেকে বের করে আনতে যাবেন না, আপা তাহলে আপনাকেও আটকে রাখবে কিন্তু।'

'তুমি কিছু বলোনি?'

'বলেছি এবং কিছু করার চেষ্টাও করেছি। আপা আমাকে শেষবারের মতো বলেছে, আমি যদি আর একবার নিলয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করি, তাহলে আমাকেও বাথরুমে আটকে রাখবে এবং কমোডের পানি খাওয়াবে।'

'আমি তাহলে যাই, এখন আর বাসায় ঢোকার দরকার নাই।'

সাত্তার ভাইকে কবিতা বাধা দিয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন আপনি? আপা তো কলবেলের শব্দ শুনেছে। আমি যে গেট খুলতে এসেছি, সেটাও দেখেছে। আপা যদি জিজ্ঞেস করে, কে এসেছিল, কী বলব তখন?'

'বলবে কুকুর এসেছিল।'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো দুলাভাই!'

'স্যরি, বলবে ফকির এসেছিল।'

'আপা তখন বলবে, এতক্ষণ ফকিরের সঙ্গে কী কথা বললি?'

'মুশকিল!'

'কোনো মুশকিল-টুশকিল নাই, আপনি বাসায় চলেন।'

সাত্তার ভাই বাসায় ঢুকেই আমাকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে ভেতরের ঘরে গেলেন। সেখানে সাত্তার ভাইয়ের বউ তাকে কোনো রকম কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একনাগাড়ে একতরফা অনেকগুলো কথা বলার পর বললেন, 'যাও, তোমার ছেলেকে বাথরুমে আটকে রেখেছি, ওকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছ, সেখানে রেখে আসো। চোখের সামনে থেকে দূর করো ওকে।'

'কোথায় রেখে আসব ওকে!'

'কোথাও রেখে আসতে হবে না, মাটি খুঁড়ে কবর দিয়ে আসো।'

সাত্তার ভাই সুবোধ বালকের মতো বললেন, 'ঠিক আছে, একটা কোদাল দাও।'

'কোদাল দিয়ে কী হবে?'

সাত্তার ভাই কাতর গলায় বললেন, 'মাটি খুঁড়তে হবে না?'

আরো কিছুক্ষণ পার্লামেন্ট মেম্বারদের মতো কথা বলে হঠাৎ করে সাত্তার ভাইয়ের বউ চলে এলেন ড্রয়িং রুমে। আমার বড় বোন মনু আপার বয়সী মেয়েটাকে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম সোফা থেকে। তিনি কোনো রকম দ্বিধা বা সংকোচ না করে আমার একটা হাত ধরে বললেন, 'কাল রাতে খেয়েছ?'

বেশ অবাক হয়ে আমি মেয়েটার দিকে তাকালাম। কপালে লম্বা একটা টিপ, ভ্রূ দুটো সুন্দর করে বাঁকানো, কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল, আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, পান খাওয়া টকটকে লাল ঠোঁট। আমি মুখটা হাসি হাসি করে বললাম, 'আপনি ভাবি?'

ছলছল চোখে ভেজা ভেজা গলায় তিনি বললেন, 'না, আপা, শেপু আপা।' তারপর টেনে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শেপু আপার মায়ায় পড়ে দেড় মাস আমি তাদের বাসায় ছিলাম এবং চুপি চুপি একটা দায়িত্ব নিয়েছিলাম। পরের পরীক্ষায় সব কটা সাবজেক্টে পাস করে ভালো রেজাল্ট করেছিল নিলয়। অথচ নিলয়ের জন্য আমি তেমন কিছুই করিনি।

বাবা প্রায়ই একটা কথা বলেন, মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষের ভেতর একটা অপরাধবোধ আছে। নিলয়কে সব সময় বকাঝকা করা হতো। শেপু আপাকে ম্যানেজ করে সেটা বন্ধ করলাম। তারপর ওকে ওর মতো চলতে দিলাম। এক দিন যায়, দুই দিন যায়, নিলয় দেখে তাকে তো কেউ কিছু বলছে না, পড়তে না বসলে বকাঝকা করছে না, বরং যা চাইছে তা-ই পাচ্ছে, ওর পছন্দমতো খেতে পাচ্ছে। মাত্র কদিন পর নিলয়ের মাঝে একটা বোধ জেগে ওঠে—সে অপরাধ করছে, সে অন্যায় করছে। পরিবর্তিত হতে থাকে সে তখন থেকেই এবং সবশেষে রেজাল্ট ভালো করে ফেলে সে!

বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শেপু আপা সাত্তার ভাইকে বললেন, 'এত দেরি করলে যে! তোমাদের না কখন আসার কথা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর ফোনটা বন্ধ কেন?'

কোনো মানুষ যখন রেগে যায়, তখন তার রাগ থামানোর জন্য প্রথম যে কাজটা করতে হয়, তা হলো চট করে তার একটা হাত ধরে ফেলা। শেপু আপার ডান হাতটা চেপে ধরে আমি বললাম, 'দেরি হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে, আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আসতে দেরি হয়েছে আমার। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দুলাভাই হিসাব মেলাতে পারছিলেন না।'

'তোর দুলাভাই তো কোনো দিনই হিসাব মেলাতে পারে না! কিন্তু তোর ফোন বন্ধ কেন?'

'মোবাইল সেটটার যেন কী হয়েছে, মাঝে মাঝে এমনি বন্ধ হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে গেছে বোধহয়।' সাত্তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে শেপু আপা বললেন, 'কাল ওকে একটা মোবাইল সেট কিনে দিয়ো তো।'

'কত টাকার মধ্যে কিনে দেব?'

'কথার ছিরি দেখো। কত টাকার মধ্যে মানে কী! সবচেয়ে দামিটা কিনে দিবা। যাও, হাতমুখ ধুয়ে আসো। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে, খেতে খেতে জরুরি কথাটা সেরে ফেলতে হবে।' শেপু আপা কিচেনের দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'দন্ত্যন শোন, জরুরি কথাটা কেবল তোকেই বললে চলবে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবি কথাটা। আমার বিশ্বাস, কাজটা তুই করে দিতে পারবি।'

হাতমুখ ধুয়ে এসে খাবার-টেবিলে বসতেই চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল আমার, যেন পারলে চোখ দুটো ছিটকে বের হয়ে আসে। সারা টেবিল খাবার দিয়ে সাজানো। বড়সড় কোনো হোটেলেও এত পদের রান্না হয় কি না আমার সন্দেহ আছে। আমার দিকে তাকিয়ে শেপু আপা বললেন, 'কিরে, ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন!'

'তুমি তো দেখি সারা বাজার তুলে এনেছ!'

'সারা বাজার তুলে এনেছি মানে কী? আরো তিন রকমের ভর্তা, দু রকমের সবজি, মুরগির মাংসের অন্য রকম একটা কারি করার ইচ্ছে ছিল। সময় পেলাম কই! নে, খেতে বোস, ওভাবে আর তাকিয়ে থাকতে হবে না।'

সাত্তার ভাই হাতমুখ ধুয়ে এসে বললেন, 'নাও, তোমার জরুরি কথাটা বলো।'

'তুমি খাও, জরুরি কথাটা তোমার না শুনলেও চলবে।'

'কবিতা কই আপা, কবিতাকে দেখছি না যে?'

'ও তো ভার্সিটির হলে সিট পেয়েছে।'

'কোন হলে?'

'শামসুন্নাহারে।' আপা আমার প্লেটে ভাত বেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'ফোন করেছিল, হল থেকে মার্কেটে গেছে কী একটা কাজে, এখনই এসে পড়বে।'

'ভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে নাকি?'

'না, ভার্সিটি তো খোলাই। তুই আসবি শুনে আসতে চেয়েছে। ওর এক বান্ধবীও আসছে সঙ্গে।'

'বান্ধবী কেন?'

'কবিতা ওর ওই বান্ধবীর কাছে তোর কথা কীভাবে যেন বলেছে, সেও তোকে দেখতে আসছে।'

'নিলয় কই আপা?'

'সমস্যাটা তো ওকে নিয়েই।'

'আবার কী সমস্যা?'

'বলছি, আগে খেয়ে নে।' আপা বড় একটা মাছের টুকরো পাতে দিয়ে বললেন, 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি নিলয় এ রকম করবে।' কথাটা শেষ করেই আপা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে হাসতে থাকেন।

'তোমার হাসি দেখে তো মনে হচ্ছে সমস্যাটা তেমন সিরিয়াস কিছু না।' আমিও হাসতে হাসতে বলি।

'সিরিয়াস, না আনসিরিয়াস, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কথাটা মনে হলেই হাসি পাচ্ছে আমার।'

'নিলয় এখন কোথায়?'

'ওর ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছে।'

কলবেলটা বেজে উঠল। সাত্তার ভাই উঠতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শেপু আপা গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। কবিতা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে আরেকটা মেয়ে। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ার ঢঙে কবিতা বলল—

'খাবার দেখে মেহমান
চাইলেন থালাখান
বললাম, থালাটাতে মস্ত এক ফুটো আছে
মেহমান বলেন তবু, ঠিক আছে ঠিক আছে।

বাব্বাহ্! আপা রে, তুই তো দেখি দুনিয়ার সব রান্না করে ফেলেছিস? তোর এই পাতানো ভাইয়ের জন্য এত কিছু! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এলে কী করবি, বল তো?'

'কিছুই করব না। বারাক ওবামা আমার কিছু হয় নাকি!'

কবিতা আমার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী পাতানো ভাই, শুধু চোখ দিয়ে খেলে চলবে না, পেট দিয়েও কিন্তু খেতে হবে। না হলে হজম হবে না, পেট ফুলে ব্যাঙের মতো হয়ে যাবেন! এমনিতেই মুখ দিয়ে কথা বের হয় না, তখন আরো বের হবে না, সারাক্ষণ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করতে থাকবেন।'

কবিতার সামনে কথা একটু কমই বলি আমি। ও আমাকে প্রায় প্রতিটা

কথাতেই সূক্ষ্ম একটা অপমান করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি সেটা গায়ে মাখি না। মাঝে মাঝে ওর কথা না বোঝার ভান করি। ও আরো খেপে যায়, আমাকে আরো অপমান করার চেষ্টা করে, আমি আরো চুপ হয়ে যাই, শান্ত হয়ে যাই।

খাওয়া শেষ করে ড্রয়িং রুমে বসেছি সবাই। শেপু আপা পান চিবুতে চিবুতে আমাদের সবার সামনে বসলেন। তারপর অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে কেবল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিলয় প্রেমে পড়েছে!'

সবাই প্রায় একসঙ্গে চোখ বড় বড় করে ফেলল। কেবল আমিই খুব স্বাভাবিক থেকে বললাম, 'নিলয় যেন কোন ক্লাসে পড়ে আপা?'

'ক্লাস নাইনে।'

'তার মানে ওর বয়স এখন পনেরো।'

'না, পনেরো বছর তিন মাস।'

'এ বয়সে একটা ছেলে প্রেমে পড়তেই পারে।'

'এটা কী বলছিস তুই!'

'তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলছি। তুমি কি জানো, বিশ-পঁচিশ বছর আগেও বারো-তেরো বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ে হতো, এবং তারা পরের বছর মা হয়ে যেত?'

'জানি।'

'প্রকৃতিগতভাবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে অনেক এগিয়ে। ছেলেরা যতই পিছিয়ে থাক, একটা ছেলে টিনএজে পা দিয়ে প্রথমে একটা প্রেমে পড়ে, যে-কাউকেই তার তখন ভালো লাগতে পারে। দু-এক বছর পর সেটা কেটে যায়। তারপর সে আরেকটা প্রেমে পড়ে। সেটাও একসময় কেটে যায়। এভাবে তারা প্রেমে পড়তেই থাকে। এতে দোষের কিছু নেই।' শেপু আপার দিকে হাসি হাসি মুখ করে আমি বলি, 'তুমি কীভাবে টের পেলে, নিলয় প্রেমে পড়েছে?'

'সন্ধ্যার দিকে ওর বিছানা গোছাতে গিয়ে দেখি অনেকগুলো চিঠি।'

'ওকে কিছু বলেছ তুমি?'

'না। শুধু জিজ্ঞেস করেছি, এ চিঠিগুলো কার?'

'কী বলেছে নিলয়?'

'কিছু বলেনি। কিন্তু এর পর থেকে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।'

'ঠিক আছে, তোমার আর কিছু করতে হবে না। আমি দেখছি।' ড্রয়িং রুম থেকে উঠে আমি নিলয়ের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এ সময় কবিতা তার বান্ধবীকে সাথে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। খাটের পাশে বসে কবিতা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু পরে ঘুমালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?'

'একটু পরে ঘুমালে হবে না, তবে একটু বেশি পরে ঘুমালে হবে।'

'ও হচ্ছে নিপুণ, আমার বান্ধবী। আপনার সঙ্গে কথা বলবে ও।'

নিপুণের দিকে তাকালাম আমি। কিছুটা রূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। আমি বললাম, 'বলুন, কী বলবেন?'

'কবিতা আপনার কথা এতবার বলেছে, আমি তো ভেবেছিলাম আপনি মহাপুরুষের মতো কেউ একজন।'

'না, আমি মহাপুরুষদের মতো কেউ নই।'

'আপনি সাধারণের চেয়েও সাধারণ।'

'আমারও তা-ই মনে হয়।'

'তা-ই যদি মনে হয়, তাহলে এ রকম ভড়ং ধরার মানে কী?'

'আপনার কি মনে হয় আমি ভড়ং ধরে থাকি?'

'ভড়ং না তো কী! আপনি কি মনে করেন নিলয়কে আপনি ঠিক করতে পারবেন, নিলয় আপনার কথা শুনবে?' নিপুণ বেশ অবজ্ঞার স্বরে কথাটা বলে।

'আমি তো নিলয়কে কিছু বলিনি যে ও আমার কথা শুনবে।'

'তাহলে?'

'সেটা তো আপনাকে বলতে পারব না।'

'শোনেন, এ রকম ভুংভাং ছাড়েন, ভালো হয়ে যান। ভালো হতে পয়সা লাগে না।'

দরজায় খুট্ করে শব্দ হতেই দেখি নিলয় ঘরে ঢুকছে, ওর হাতে ওর সেই চিঠিগুলো। আমার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি ওর পিঠে একটা হাত রেখে পাশে বসালাম। মাথা নিচু করে ও আমার পাশে বসে বলল, 'মামা, এই নাও চিঠিগুলো। দিস ইজ লাস্ট। আর এ রকম হবে না।'

'থ্যাংক ইউ বাবা। যা, খুব আরাম করে এখন ঘুমা। সকালে ঘুম থেকে

উঠে ভাববি, আজ থেকে নতুন একটা কিছু শুরু হলো তোর জীবনে। কী শুরু হলো, সেটা পরে বলব তোকে। আর একটা কথা, তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, অল্প দিনের মধ্যে সেটা পেয়ে যাবি।'

নিলয় চলে গেল। আমি শোয়ার জন্য বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই নিপুণ বলল, 'এটা কীভাবে সম্ভব হলো?'

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। নিপুণের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'নিলয়কে শুধু বলেছিলাম, বাবা, তুই যে কাজটা করেছিস, সেটাতে শুধু তুই আনন্দ পাচ্ছিস, আর সবাই কষ্ট পাচ্ছে। এবার বল, কোনটা তোর কাছে বড়—তোর একার আনন্দ, না সবার কষ্ট? যেটা বড় হয়, তুই সেটা বেছে নিস।' নিপুণের দিকে একটু হেসে বলি, 'এর পরেরটুকু তো দেখলেন।'

শেপু আপা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন, 'কিরে, তুই যে ব্যাগটা এনেছিস, সেটা কার ব্যাগ?'

'কেন?'

'ব্যাগটা খুলে দেখেছিস তুই?'

'না তো!'

'ব্যাগের ভেতর তো টাকা দিয়ে বোঝাই। কার টাকা এসব?'

'জানি না।'

'জানি না মানে!'

'ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছি আপা। ব্যাগটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাল সকালে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।'

ঘোর-লাগা পায়ে আপা চলে গেলেন। নিপুণের চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে, কবিতারও। নিপুণ একটু এগিয়ে এসে বলল, 'এতগুলো টাকা, কী করবেন আপনি?'

'আপাতত জানি না।'

মানুষকে অবাক করে দিতে অনেকেরই ভালো লাগে, আমারও ভালো লাগে। নিপুণ, কবিতা—দুজনই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। দু-দুটো রূপবতী তরুণীকে দাঁড় করিয়ে রেখে বালিশে মাথা রাখলাম আমি।

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দন্ত্যন রুহমান

খুব সকালে শেপু আপার বাসা থেকে চলে এসেছি আমি। আপা অবশ্য আসতে দিতে চাননি। কিন্তু ব্যাগের টাকাটা ফেরত দেয়ার কথা বলে চলে এসেছি। টাকাটা দ্রুত ফেরত দেয়া দরকার। এতগুলো টাকা হারিয়ে ওই সংসারের মানুষগুলোর মন নিশ্চয় অনেক খারাপ হয়ে আছে। তা ছাড়া বাসায়ও যেতে হবে। বেশ কয়েক দিন হলো বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি।

ব্যাগের ভেতর দুটো পাসপোর্টও পাওয়া গেছে। একটা বয়স্ক মানুষের পাসপোর্ট, আরেকটা কমবয়সী একটা মেয়ের। পাসপোর্টের বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী গিয়েছিলামও সেই জায়গাটায়, কিন্তু গিয়ে দেখি বাড়িতে তালা ঝোলানো। আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। ইট-পাথরের খাঁচায় বাস করা এই কংক্রিটের নগরীর মানুষগুলো ক্রমান্বয়ে পাথর হয়ে গেছে। পাথর হয়ে গেছে তাদের মন, দেহ, চোখ—সবকিছু। তারা আর এখন কারো খোঁজখবর রাখে না; ভাব বিনিময় হয় না, কুশল বিনিময় হয় না তাদের; কেউ মারা গেলে খবর পায় না পাশের বাসার মানুষগুলোও।

পাসপোর্টে অবশ্য স্থায়ী ঠিকানাও আছে। সিরাজগঞ্জের একটা গ্রাম। যেতে তেমন সময় লাগবে না, তবু আরো দু-তিনটা দিন দেরি করব। দেখি এর মধ্যে তারা ফিরে আসেন কি না বর্তমান ঠিকানার বাসায়।

ব্যাগটা চেপে ধরে আছি আমি। অথচ কালও কী অবহেলায় ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সারাটা দিন ঘুরেছি। আচ্ছা, ব্যাগটা কি একটু গরম গরম লাগছে? টাকা বোঝাই থাকলে কি কোনো কিছু গরম হয়ে যায়? সম্ভবত যায়। নইলে একটু টাকা-পয়সা হলেই মানুষের এত দেমাগ বাড়ে কেন, মানুষ কেন এত অহংকারী হয়ে যায়!

বেইলি রোডে এসে আগে একটা মেয়েকে খুঁজতাম। বেশির ভাগ সময়

দেখতাম, মেয়েটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, উদাস হয়ে কী যেন দেখছে। পাগলের মতো দেখতে মেয়েটার চোখে হঠাৎ হঠাৎ পানিও দেখা যেত। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, কিছুদিন পরপরই মেয়েটার পেটটা একটু উঁচু উঁচু দেখা যেত, সে পেটটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকত, একসময় সেটা এত বেশি উঁচু হয়ে যেত, রাস্তা দিয়ে চলার সময় সবাই তার দিকে একবার হলেও ফিরে তাকাত।

হঠাৎ একদিন মেয়েটাকে দেখা যায় না এবং অনেক দিন দেখা যায় না। তারপর আবার হঠাৎ তাকে দেখা যায়। আশ্চর্য, তার ফুলে ওঠা পেটটা তখন উধাও! তাকে বেশ রোগা রোগা দেখা যায় তখন, চেহারাটা পানসে মনে হয়, কেবল তার চুলগুলো একটু পরিষ্কার মনে হয়, এ কদিন কে যেন যত্ন করে আঁচড়িয়ে দিয়েছে তার চুলগুলো।

আমি একদিন মেয়েটার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'আপনাকে দেখে আমার কী মনে হয়, জানেন?'

তালশাঁসের মতো ফ্যাকাসে চোখে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়েছিল, কিছু বলেনি। আমি তখন গলাটা খাদে নামিয়ে বলেছিলাম, 'প্রতারিত অনেকেই হয়, সে অন্যের দ্বারা। কিন্তু নিজেকে নিজে প্রতারিত করার চেয়ে খারাপ কিছু আর নেই। আপনি কী বলেন?'

মেয়েটা কিছু বলেনি, কাঁদছিল শুধু।

অনেক দিন হলো মেয়েটাকে আর দেখি না।

হাঁটতে হাঁটতে বেইলি রোডে এসেছি। আজ এসেছি বাশার আলীর খোঁজে। লোকটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এর চেয়েও বড় একটা কারণ আছে। আজ তাকে আমি একটা গল্প শোনাব। গল্পটা খুবই জটিল এবং ভয়াবহ। আমি নিশ্চিত, বাশার আলী গল্পটা শুনে এত অবাক হয়ে যাবেন যে শেষে আমাকে গুরু বলে ডাকা শুরু করবেন!

না, সারা বেইলি রোড ঘুরেও বাশার আলীকে পাওয়া গেল না। সম্ভবত তিনি আজ অন্য কোথাও গেছেন। এক জায়গায় প্রতিদিন গল্পের আসর জমে না, মাঝে মাঝে জায়গা বদলাতে হয়।

মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। পকেট থেকে বের করে রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে নিলয় বলল, 'মামা, চিঠিগুলো তো তুমি নিয়ে যাওনি।'

'আমি ওগুলো দিয়ে কী করব?'

'আমি তাহলে ওগুলো ফেলে দিই?'

'তোর কি ওগুলো রাখতে ইচ্ছে করছে?'

'না, ঠিক রাখতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যে ঘরে তুমি ঘুমিয়েছিলে, সেখানে পেলাম তো!'

'তুই বরং নষ্ট করেই ফেল। যা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, তা চোখের সামনে না রাখাই ভালো।'

নিলয় একটু চুপ থেকে বলল, 'মামা, একটা কথা বলব?'

'বল।'

'পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই ভালোবাসা আসে, তারা সবাই ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়। বুড়ো হয়ে গেলেও মানুষ এসব ছাড়তে পারে না। কিন্তু ছোটরা এসব করলে সবাই আপত্তি করে কেন?'

'তোর খুব মন খারাপ, না?'

'না, মন খারাপ না। আমার কষ্ট হচ্ছে, সবাই যেটা করতে চায়, ছোটরা সেটা করলে দোষ কী? আমি এখন রাখি, ছোট খালা তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

কবিতা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'খুব যে না-বলে চলে গেলেন!'

'আপনারা ঘুমাচ্ছিলেন।'

'একটু পরে গেলে কী হতো?'

'কিছুই হতো না।

'নিপুণ আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ও একটু কথা বলতে চায় আপনার সঙ্গে, আপনি কথা বলবেন কি না।'

'অবশ্যই। কথা না বলার তো কিছু নেই।'

আমি এপাশ থেকে বুঝতে পারলাম, কবিতা মোবাইল ফোনটা নিপুণের হাতে দিয়েছে। কিছুটা ইতস্তত করছে নিপুণ। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'থাক, এখন কোনো কথা বলার দরকার নেই। সব কথা সব সময় বলতে নেই। আচ্ছা, বলেন তো, কাল পূর্ণিমা ছিল কি না?'

বাসার কাছাকাছি এসেই প্রতিবার আমি একটু স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিই, চোখ বুজে অনুভব করি নিজের আশ্রয়ের উষ্ণতা, গেটের কাছের হাসনাহেনা গাছের ফুলের সুবাস স্বাগত জানায় নিঃশঙ্কচিত্তে। আর সমস্ত আকুলতা নিয়ে আমাদের টিনের ঘরের এক মৌন অপেক্ষা আমাকে অপরাধী করে তোলে—এই আমি তাকে ছেড়ে মাঝে মাঝে চলে যাই বলে, তার চালে

টুপুর টুপুর করে পড়া শিশিরের শব্দ মিস করি বলে!

বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মিতি বলল, 'ভাইয়া, তুই এলি তো এলি, অনেক দিন পর এলি। তাও আবার এমন একটা দিনে এলি!'

'এমন একটা দিন মানে!' কথাটা মনে হতেই আমি ম্লান হেসে বলি, 'ও, আজ তো বৃহস্পতিবার।'

সপ্তাহে এক রাত আমরা না-খেয়ে থাকি। আর সেই রাতটা হলো বৃহস্পতিবারের রাত। কোনো কারণ থাকুক বা না-থাকুক, এ রাতে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে থাকি অনেকক্ষণ। আগে আমরা এটা-ওটা নিয়ে আলোচনা করতাম, পরামর্শ করতাম, এখন করি গল্প। বাবাকে ঘিরে আমরা প্রত্যেকে সারা সপ্তাহে নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে একটা করে গল্প বলি। আমার বড় বোন মনু আপা আর আমি তাও দু-একটা গল্প বলতে পারি, কিন্তু আমার ছোট দু বোন মিতি আর লুবা কোনো গল্পই বলতে পারে না। গল্প বলার সময় ওরা হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে।

সবাই গল্প বলার চেষ্টা করে কিন্তু মা কোনো কথা বলে না এ রাতে। মা তার জীবনের সেরা যত্ন আর ভালোবাসা নিয়ে রং-চা বানিয়ে খাওয়ায় আমাদের, সঙ্গে কিছু মুড়ি কিংবা নরম হয়ে যাওয়া দু-একটা বিস্কুট। আমরা প্রত্যেকে সেই চা এমনভাবে খাই যে কাপের সঙ্গে এক ফোঁটা চা-ও আর অবশিষ্ট থাকে না। এক ফোঁটা চা থাকা মানে মায়ের এক ফোঁটা ভালোবাসা মিস—আমরা কেউই আমাদের মায়ের এক ফোঁটা ভালোবাসা হারাতে চাই না, কখনোই না!'

বাবা অবশ্য এ রাতে সবচেয়ে বেশি গল্প বলেন। তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প বলে চলেন আমাদের। আমরা মুগ্ধ হয়ে বাবার সেই গল্পগুলো শুনি। মাঝে মাঝে বাবা তার দুঃখের কিছু গল্প বলতে নিয়েই থেমে যান। আমরা কেউই তখন কিছু বলি না। কেবল পিচ্চি লুবাটা বলে, 'বাবা, তারপর?' বাবাও তখন কিছু বলেন না। মাথাটা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকান তিনি। কোনো কোনো দিন আকাশে চাঁদ থাকে না, তবু আমরা টের পাই—বাবার চোখ দুটো ভিজে উঠেছে, জ্যোৎস্নালোকিত উঁচু বৃক্ষের পাতার মতো চকচক করছে তার কাঁপা কাঁপা দুটো ঠোঁট।

মিতি আমার একটা হাত টেনে ধরে বলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস, ঘরে চল।'

কিছুটা চমকে উঠে আমি মিতির দিকে তাকিয়ে বলি, 'আগে তো আমরা

তিন রাত না-খেয়ে থাকতাম। এখন এক রাত না-খেয়ে থাকি। আগে নাহয় তিন রাত না-খেয়ে কিছু টাকা বাঁচানো যেত, এখন এক রাত না-খেয়ে কত টাকা আর বাঁচানো যায়! এতে তোদের লেখাপড়ার কতটুকু খরচই বা আসে!'

'আসে ভাইয়া, আসে। আমরা খাতা, কলম, আরো দু-একটা জিনিস কিনতে পারি এ টাকা দিয়ে। এটাই বা কম কিসে! আগে শুধু বাবা চাকরি করতেন, আমাদের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর জন্য তাই আমরা তিন রাত না-খেয়ে থাকতাম; এখন মনু আপাও চাকরি করেন, সে জন্য আমরা এক রাত না-খেয়ে থাকি। তা ছাড়া— ।'

'তা ছাড়া?'

'তা ছাড়া, তুইও তো লেখাপড়া বন্ধ করে দিলি, তোর লেখাপড়ার জন্যও তো এখন কোনো খরচ করতে হয় না। অথচ তুই কত ভালো ছাত্র ছিলি!' মিতির গলাটা ভারী হয়ে আসে।

মিতিকে সহজ করার জন্য আমি হাসতে হাসতে বলি, 'জানিস না, এক ঘরে কখনো দুই পীর থাকে না। তেমনি এক ঘরে দুজন ভালো শিক্ষার্থীও থাকা উচিত না। তুইও তো ভালো ছাত্রী, ইন্টারমিডিয়েটে কী ভালো রেজাল্টই না করলি! ভাগ্যটাও কী ভালো তোর, এক চান্সেই ঢাকা ভার্সিটির মতো জায়গায় ভালো একটা সাবজেক্টে ভর্তি হতে পেরেছিস। এ আনন্দ রাখি কোথায়, বল? বাবা তো এখন যাকে পান তাকেই তোর কথা বলেন, মনে হয় বাবার আর কোনো ছেলে-মেয়ে নেই!'

আমি আগের মতোই হাসতে থাকি, মিতি কিছু বলে না, কেবল আমার হাতটা খামচে ধরে একটু জোরে।

আমরা ঘরে ঢোকার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে এলেন বাবা। প্রতিবার বাড়ি থেকে পালানোর পর আবার বাড়ি ফিরে এলে বাবার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, বাবা তখন আমার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ান। তারপর আমার বুকের কাছে শার্টের একটা বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'কেমন আছেন আপনি?'

বাবা সাধারণত সহজে রাগেন না। যদি কখনো রেগে যানও, তখন তিনি আমাদের সবাইকে আপনি আপনি বলে সম্বোধন করতে থাকেন। বাবা তারপর বলেন, 'এবার কত দিন হলো?' মানে আমি বাড়ি থেকে পালানোর কত দিন পর আবার বাড়ি ফিরলাম। সেটার জবাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আবার বলেন, 'এবার কদিন না-খেয়ে থাকা হয়েছে?' সেটার জবাবও দিই

আমি। বাবা আবার বলেন, 'না-খেয়ে থাকতে কেমন লাগে?' বরাবরের মতো আমি জবাব দিই, 'অদ্ভুত! পৃথিবীর সবকিছু তখন খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। রাস্তার ইটগুলোকে মনে হয় কেক, ইটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোগুলোকে মনে হয় ভাত, ঘাসগুলো সবজি, আকাশের মেঘগুলো ফিরনি আর ড্রেনের পানিগুলোকে মনে হয় শরবত। তখন সবকিছুকে সুস্বাদু মনে হয় বাবা, সব একসঙ্গে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে!'

বাবার চোখ দুটো ভিজে ওঠে তখন। সেই টলটলে চোখ নিয়ে বাবা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন তিনি আমাকে এই প্রথম দেখছেন কিংবা হারিয়ে যাওয়ার বহু বছর পর তিনি আমাকে খুঁজে পেয়েছেন। অপরাধবোধে বুকটা হু হু করে ওঠে আমার। আমি তখন বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'বাবা, তুমি কাঁদছ?' বাবা তখন বলেন, 'আমি কি ভুল করছি, আমার কি এখন হাসা উচিত? আমার সন্তান কী একটা কারণে কদিন পর পর কাউকে কিছু না-বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, না-খেয়ে থাকে, অনেক দিন পর বাসায় ফেরে—এসব দেখে আমার হাসা উচিত? আপনি বলেন, আমার হাসা উচিত?' তারপর বাবা রোবটের ছন্দময় হাঁটার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে যান, বাবার সে হাঁটা দেখতে দেখতে চোখে পানি এসে যায় আমার।

বাবা এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। বাবাকে আজ আমি কোনো সুযোগ দেব না। বাবা আজ আমার সামনে এসে আমার শার্টের বোতাম ধরার আগেই আমি বলব, 'বাবা, বলো তো, একজন বাবা কতটুকু ভালো হলে তার বুকে মাথা মাথা রেখে ঘুমাতে ইচ্ছে করে সারাক্ষণ!'

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দন্ত্যন রুহমান

সকালে ঘুম ভাঙল মোবাইল ফোনের শব্দে। একটা মেসেজ এসেছে। সাধারণত রাতে আমি মোবাইল বন্ধ রেখে ঘুমাই। কাল কী এক কারণে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ও, মনে পড়েছে—মিতি নিয়েছিল সেটটা। কথা বলে রেখে গেছে, সম্ভবত আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পাশ থেকে মোবাইল সেটটা নিয়ে মেসেজটা ওপেন করি—যখন আমি কোনো প্রজাপতির পাখা স্পর্শ করি, প্রজাপতি বলে, আমার মতোই তোমার জীবন হোক বর্ণিল। যখন কোনো নীল ঘাসফুলকে স্পর্শ করি, ঘাসফুল বলে, তোমার কপালে একদিন নীল টিপ হয়ে ভেসে থাকব সারাক্ষণ। যখন কোনো নদীর পানি স্পর্শ করি, তখন নদী বলে, জলতরঙ্গের মতো তুমিও বয়ে যাও প্রতিদিন, নীরবে। আর কেবল আপনাকে স্পর্শ করলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলে ওঠেন—হাম্বা হাম্বা।

মেসেজটা অর্পা পাঠিয়েছে। ডান পাশের যে বিশাল বাড়িটার ছায়া প্রতিদিন আমাদের টিনের বাড়িটাকে ঢেকে দেয়, যে ছায়া দেখে প্রতিদিন আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, অর্পা সেই বাড়িতে থাকে। মানে, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে। এই বাড়িতে আরো থাকে অর্ণা, অর্পার ছোট বোন, যে সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে আমার সঙ্গে; থাকেন অর্পার বাবা বদিউল আলম, কিছুক্ষণ পর পর আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে পরামর্শ করেন; আর থাকেন অর্পাদের দারোয়ান-কাম-কেয়ারটেকার মোখলেস ভাই, যিনি কী এক অজানা কারণে প্রচণ্ড স্নেহ করেন আমাকে।

অর্পার মেসেজটার একটা উত্তর দেয়া দরকার। একটু ভেবেই উত্তরটা লিখে ফেললাম আমি—ঠিকই তো আছে। আপনাকে বোঝানোর জন্য আমি তো আপনার ভাষাতেই কথা বলব, নাকি? আর ওই হাম্বা হাম্বার মানে কী, জানেন? গায়ে হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্পা আরেকটা মেসেজ পাঠাল—কাল রাতে ভয়াবহ

একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখেছি, বাংলাদেশের সব গাধা মরে গেছে। আপনি কি বেঁচে আছেন? ভীষণ চিন্তায় আছি আমি। আপনি তো ফোন প্রায় বন্ধই রাখেন। যাক, এখন খোলা রেখেছেন। যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে একটা মিসকল দিয়েন আমাকে। ভাবব, যাক, একটা গাধা অন্তত বেঁচে আছে দেশে!

হাসলাম আমি। এ মেসেজটারও একটা উত্তর লেখা দরকার। উত্তরটা লিখেও ফেললাম আমি—গাধা দেখতে যেন কেমন? এ মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না। আপনি কি আপনার একটা ছবি এমএমএস করে পাঠাবেন? আমি নিশ্চিত, আমি তখন বুঝতে পারব, গাধা দেখতে কেমন।

মেসেজটা পাঠিয়েই সেটটা বন্ধ করে দিলাম আমি। নইলে এ রকম মেসেজ চলতেই থাকবে, সারা দিনও শেষ হবে না।

অর্পার সঙ্গে আমার পরিচয়টা হঠাৎ করেই। আমাদের বাড়ির পাশে ওদের বাড়িটা করতে দেখে আমি প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিদিন আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়াতাম আমি আর মনে মনে ভাবতাম—একটা মানুষের কত টাকা হলে এ রকম একটা বাড়ি বানাতে পারে! মাঝে মাঝে একটা হিসাবও করতাম আমি, আমাদের বাড়ির কী কী বিক্রি করলে অর্পাদের বাড়ির সামনের গেটটার মতো মাত্র একটা গেট কেনা যাবে? আমি হিসাব করে দেখেছি, ওরকম একটা গেট কেনার জন্য আমাদের সব কটা টিনের ঘর বিক্রি করতে হবে! এমনকি আমাদের ঘরের ভেতর যা কিছু আছে, তাও বিক্রি করতে হতে পারে।

অর্পাদের বাড়ির দিকে এভাবে একদিন তাকিয়ে ছিলাম আমি। বিশেষ করে দোতলার দিকে। অদ্ভুত সুন্দর একটা ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছে দোতলার বারান্দায়। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে আছি সেদিকে। হঠাৎ করে গেট দিয়ে একটা মেয়ে বের হয়ে আমার সামনে এসে বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে অসভ্যের মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আপনি, কেন?'

'আপনার দিকে তাকিয়ে আছি! কোথায় আপনার দিকে তাকালাম?' প্রচণ্ড অবাক হয়ে আমি বললাম।

'আমার দিকে তাকাননি! আপনি ফ্যালফ্যাল করে এতক্ষণ দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে ছিলেন না?'

'হ্যাঁ, তা ছিলাম।'

'ওখানে কে বসে ছিল?'

'কোথায়?'

'দোতলায় ওই নীল অপরাজিতা গাছের আড়ালে?'

'আমি জানি না। আমি কেবল দেখেছি, ওইখানে একটা ঝাড়বাতি ঝোলানো আছে, যে ঝাড়বাতির দিকে একবার তাকালে সহজে চোখ ফেরানো যায় না।'

'আপনি ঝাড়বাতি দেখছিলেন?'

'জি, স্রেফ ঝাড়বাতি। বিশ্বাস করুন, আর কিছু না।'

অর্পা ফিরে যাচ্ছিল। আমি বললাম, 'শুনুন।'

ঘুরে দাঁড়াল অর্পা। দু পা এগিয়ে গেলাম আমি ওর দিকে। তারপর সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'একটা বস্তু আর একটা ব্যক্তি যখন একসঙ্গে থাকে, আর মানুষজন যখন ওই ব্যক্তির দিকে না তাকিয়ে ওই বস্তুর দিকে তাকায়, ব্যক্তির তখন কেমন লাগে? ব্যক্তির চেয়ে বস্তুর মূল্য তখন বেশি হয়ে যায় না?' আমি একটু থেমে বলি, 'আর একটা কথা, সব সৌন্দর্যের দিকেই মানুষ তাকায়, এটা তার সহজাত প্রবৃত্তি। একদিন দেখলেন আপনার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, কেউ আপনাকে ফিরেও দেখছে না, খারাপ লাগবে না আপনার? সূক্ষ্ম একটা অবহেলিতের ছায়া এসে পড়বে না আপনার অস্তিত্বে?'

এর পর থেকে আমি আর কখনো অর্পাদের বাসার দিকে তাকাই না। ওদের বাসার সামনে দিয়ে সুবোধ বালকের মতো মাথা নিচু করে হেঁটে যাই। হেঁটে যাওয়ার সময় আমার আর কখনো মনে হয় না, আমার হাতের ডান পাশে সুন্দর একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়ির দোতলার বারান্দায় একটা চমৎকার ঝাড়বাতি আছে, সেই বাড়িতে একটা রূপবতী মেয়েও আছে।

এ ঘটনার মাস দেড়েক পর অর্পাদের বাসার সামনে দিয়ে একদিন যাচ্ছিলাম। অর্পা হঠাৎ দৌড়ে ওদের গেট দিয়ে বের হয়ে আমার সামনে এসে বলল, 'আমাদের বাসায় একটু আসবেন?'

অর্পার কাতর গলা শুনে আমি বললাম, 'কেন?'

'আমার বাবা যেন কেমন করছে।'

'কেমন করছে?'

'তা বলতে পারব না। আপনি একটু আসুন, প্লিজ।'

মাথা নিচু করে এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমি। অর্পার চোখের দিকে তাকালাম। মেয়েটা কান্না কান্না করে ফেলেছে চেহারাটা। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। তরুণ বুক তো! বললাম, 'চলুন।'

বাসার ভেতর প্রথমে অর্পা ঢুকল, পেছন পেছন আমি। একটু একটু করে বাসার ভেতর ঢুকছি, একটু একটু করে অবাক হচ্ছি। সবগুলো অবাক একসঙ্গে করে যখন আমি বাসার দোতলায় উঠলাম, তখন আর অবাক হওয়ার বোধটা শেষ হয়ে গেছে। জীবনে খুব বেশি কিছু দেখিনি আমি, যা-ই দেখেছি, কিন্তু কোনো বাসার ভেতরটা যে এত সুন্দর হতে পারে, বাসার জিনিসপত্র এত মোহনীয় হতে পারে, জানা ছিল না তা আমার। সবকিছু কী নিখুঁত, কী পরিপাটি, কী চমৎকার!

দোতলার প্রথম ঘরটাতে ঢুকেই অর্পা একটা সোফা দেখিয়ে বলল, 'একটু বসুন।'

সোফাতে বসতেই অর্পা আমার পাশে বসে আগের চেয়ে কাতর গলায় বলল, 'আমার বাবা আছেন পাশের ঘরে। তিনি এখন ড্রাংক অবস্থায় আছেন। বাবা প্রতিদিনই ড্রিংক করেন, তবে বছরের একটা দিন একটু বেশি করেন। সেদিন সকাল থেকেই ড্রিংক শুরু করেন তিনি। কারো কথা শুনতে চান না, একনাগাড়ে ড্রিংক করতে থাকেন আর চিৎকার করতে থাকেন।'

'আজ কি সেই দিন?'

'জি।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আমরা যখন অন্য এক বাসায় ছিলাম, তখন এই দিনে পাশের বাসার এক আঙ্কেল এসে বাবার সঙ্গে কথা বলে স্বাভাবিক করতেন বাবাকে। আমার মনে হচ্ছে, আপনি যদি বাবার সঙ্গে একটু কথা বলেন, তাহলে বাবা একটু স্বাভাবিক হয়ে আসবেন এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়বেন। প্লিজ।'

কী আকুল হয়ে মেয়েটা কথা বলছে! চোখ দুটো ভিজে উঠেছে তার। এ রকম পরিস্থিতিতে কখনো পড়িনি আমি। কীভাবে যে কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আমি পাশের রুমে গেলাম। ঝট করে দম বন্ধ হয়ে এলো আমার। সারা ঘর তীব্র একটা ঝাঁঝাল গন্ধে ভরে গেছে। খালিগায়ে লুঙ্গি পরা একটা মানুষ মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছেন একটা চেয়ারে। তার সামনে ছোট টেবিলটাতে দু-তিনটা খালি বোতল আর গ্লাস পড়ে আছে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে দুলে দুলে উঠে দাঁড়ালেন অর্পার বাবা। তারপর আমার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন, 'ওয়ালাইকুম..., ওয়ালাইকুম...।'

'আঙ্কেল, ভালো আছেন?'

'না রে বাবা, একদম ভালো নেই। ঘরের ভেতর শুধু মশা।'

'হ্যাঁ, মশা। ঘরের ভেতর প্রচুর মশা।'

খ্যাকখ্যাক করে হঠাৎ হেসে উঠে তিনি বললেন, 'মশা মারার একটা বুদ্ধি অবশ্য আমার কাছে আছে।'

'কী বুদ্ধি আঙ্কেল?'

'বুদ্ধিটা খুব সোজা। ঝপ করে প্রথমে তুমি একটা মশা ধরবে, তারপর জোর করে দু হাতের দু আঙুল দিয়ে মশাটার মুখটা তুমি হাঁ করে ফেলবে। কী, পারবে না?'

'জি, পারব।'

'গুড। তারপর ওই হাঁ-মুখের ভেতর মশা মারার এক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দেবে। ব্যস, মশার কম্ম সাবাড়। এভাবে তুমি ঘরের সব মশা মেরে ফেলতে পারবে।' আঙ্কেল চোখমুখ চিকচিক করে হাসতে হাসতে বলেন, 'কী, ভালো বুদ্ধি না?'

'খুবই ভালো বুদ্ধি। কিন্তু এতে তো অনেকের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

হিক করে একটা শব্দ করে আঙ্কেল বলেন, 'কার ক্ষতি হবে?'

'এই যে এত কয়েল কোম্পানি আছে, আপনার এই বুদ্ধি প্রয়োগ করলে তারা তো একেবারে পথে বসে যাবে।'

'আমি তো এটাই চাই। ওই সান অফ বিচদের কয়েলে কিছু হয় নাকি! ওই কয়েল জ্বালালে যে ধোঁয়া হয়, মশারা সেই ধোঁয়ায় তো কানের কাছে এসে ব্যান্ডসঙ্গীত গায়। ভালো কথা—।' আঙ্কেল লুঙ্গিটা কোমরের কাছে কোনোরকম গিট্টু দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাকে এখন একটা গান শোনাব, শুনবে না?'

'কেন শুনব না, অবশ্যই শুনব।'

আঙ্কেল সটান হয়ে দাঁড়ান। তারপর হাত-পা শক্ত করে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মতো করে গাইতে থাকেন—'বন্ধু যখন হেইল্যা দুইল্যা আমার চোখের সামনে দিয়া মুচকি হাসি হাসতে হাসতে হাঁইট্যা যায়, পরানটা ফাইট্টা যায়, কইলজাটা ফাইট্টা যায়...। কী, কেমন লাগছে গানটা?'

'খুবই সুন্দর।'

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাদা গানটা খুব ভালো গেয়েছে, না?'

'খুবই ভালো গেয়েছে। মমতাজও এতো ভালো গাইতে পারত না।'

'মমতাজটা কে?'

'মমতাজ হচ্ছে আঙ্কেল..., ওই যে..., বিখ্যাত সব কবিতা লিখেছেন

যিনি—মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি... ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো মনে হয় আমাদের জাতীয় সঙ্গীতও লিখেছেন—আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি... ।' আঙ্কেল একটু থেমে বলেন, 'আচ্ছা, তুমি যে এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তুমি কে, হু আর ইউ?'

'আমি আপনার পাশের বাসায় থাকি ।'

'ও আচ্ছা, তাই তো বলি, তোমাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন। আচ্ছা, আমার চোখ দুটো বুজে আসছে কেন? দেখো তো, আমার ঘুম আসছে কি না? তুমি আমাকে একটু ধরো তো ।'

আঙ্কেল আস্তে আস্তে বসে পড়েন মেঝেতে। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন সেখানে। ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। ঘর থেকে বের হয়ে আসি আমি। অর্পা অধীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আমাকে দেখেই কৃতজ্ঞভরা চোখে বলল, 'থ্যাংক ইউ ।'

'বছরের এই দিনটা আসলে কিসের দিন?' অর্পার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি আমি।

'এদিন আমাদের মা মারা গেছে!'

'কীভাবে?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর অর্পা বলল, 'অন্য একদিন বলি?'

না, অর্পার সেই কথাটা আমার শোনা হয়নি। আমিও কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আমাদের দুজনের মাঝে মাঝে অনেক কথাই হয়, অর্পা অনেক কিছুই বোঝাতে চায় আমাকে। আমি সেসব বুঝি। কিন্তু না বোঝার ভান করে এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিই। অর্পার রাগটা এখানেই।

বোকা মেয়ে, চাঁদ দেখতে গেলেও মাথাটা উঁচু করতে হয়। সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝে হাঁটতে হাঁটতে সেই কবেই আমাদের মাথাটা নিচু হয়ে গেছে। চাঁদ দেখা তো দূরের কথা, আবার হাত বাড়িয়ে সেটা ছুঁতে যাওয়া, এ অসম্ভব, আমাদের জন্য এটা পাপ!

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি সারাটা দিন। সকালে মা এসে বিছানায় খাবার দিয়ে গেছে এবং প্রতিবার খাবার দেয়ার সময় যা বলে, তখনো তা-ই বলেছে, 'তুই অনেক শুকিয়ে গেছিস, নজির!'

মার কথা শুনে আমি হেসেছি। মা রেগে যায় আমার হাসি দেখে, 'এত

হাসছিস কেন, আমি কি মিথ্যা বলেছি?'

হ্যাঁ, মা মিথ্যা বলেছে। কিন্তু কী করে বলি তা। কারণ গত সপ্তাহে আমি আমার ওজন মেপেছি, আগের চেয়ে তিন কেজি ওজন বেড়েছে আমার। বেইলি রোড দিয়ে আসার সময় দেখি, একটা বুড়োমতো লোক ওজন মাপার যন্ত্র নিয়ে বসে আছে। সাধারণত আমি নিজের ওজন মাপি না। কিন্তু লোকটাকে দেখে ভীষণ মায়া হলো, কেমন যেন মুখ শুকনো করে বসে আছে যন্ত্রটা সামনে নিয়ে। লোকটার সামনে গিয়ে বললাম, 'চাচা, আজ কজনের ওজন মেপেছেন?'

চামড়া ঝুলে পড়া ছোট ছোট চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন লোকটা। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন কি না, নিশ্চিত নই আমি। আমি আবার প্রশ্নটা করতেই তিনি বললেন, 'একজনেরও না।'

'কেন?'

'বাবা রে, মানুষ এখন ঠিকমতো খাইবারই পায় না। খাইবই কী আর ওজনই মাপব কী!'

রাত হয়ে গেছে। একটু পর আমাদের সাপ্তাহিক মিটিংটা বসবে, গল্প বলার মিটিং। মিটিংটা বৃহস্পতিবার, মানে গতকাল হওয়ার কথা ছিল, হয়নি। আজ হবে। মিতি এসে এর মাঝে একবার ডেকেও গেছে। কিন্তু আমি শুয়েই আছি, উঠতে ইচ্ছে করছে না আমার।

সকাল থেকেই দুটো চড়ুইপাখি আমার জানালায় এসে বারবার উঁকি দিচ্ছিল। ওদের দেখে মনে হয়েছে, আমার ঘরে ঢুকতে চাইছে ওরা। কিন্তু আমাকে দেখে সাহস পায়নি। একসময় আমি চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকি। একটু পর আলতো করে চোখ খুলে দেখি, আমার ঘরের ভেতর টিনের চালের নিচে যে কাঠ আছে, সেই কাঠের ফাঁকে ঢুকছে চড়ুই দুটো। একটু ভালো করে খেয়াল করতেই টের পাই, ওখানে বাসা বেঁধেছে পাখি দুটো এবং চিঁ চিঁ শব্দ শুনে বুঝে যাই, বাচ্চাও হয়েছে ওদের। কী অপরিসীম আনন্দ যে লেগেছিল তখন!

শব্দ করে মিতি ঘরে ঢোকে। তারপর আমার হাত টেনে ধরে বলে, 'ভাইয়া, তুই কী, বল তো! বাবা বসে আছেন, সবাই বসে আছে।'

'তুই যা, আমি আসছি।'

'না, তুই ওঠ, আমরা একসঙ্গে যাব।'

'আজ গল্প না করলে হয় না?'

'বাবা মন খারাপ করবেন। কালও তোর জন্য গল্প করা হয়নি।'

আড়মোড়া ভেঙে আমি উঠে বসি। মিতি আমাকে টানতে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াই। বারান্দায় এসে দেখি সবাই বসে আছে। বাবা আমাকে দেখে একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'যাক, আমার রাজপুত্র বাবা এসে গেছে। আমরা এখন গল্প শুরু করতে পারি।'

মনু আপার পাশে ফাঁকা জায়গাটায় বসি আমি। আপা সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার চুলে হাত বোলাতে থাকে। সবার দিকে একবার তাকিয়ে আমি বলি, 'আজ আমি প্রথম গল্প বলব, অন্য রকম গল্প।'

বাবা বলেন, 'ওকে, নো প্রবলেম।'

'এর আগে আমি এক কাপ চা খাব।'

লুবা উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'চা রেডি।'

মা ফ্লাস্ক থেকে একটা মগে চা ঢালতে থাকে। তা দেখে আমি বলি, 'ফ্লাস্ক কিনেছে নাকি আমাদের?'

লুবা আগের মতোই উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'বড় আপু কিনেছে।'

চায়ে চুমুক দিয়েই আমার বাশার আলীর কথা মনে পড়ে যায়। সবার দিকে আমি বলি, 'সাতকানিয়ার দুবলা গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম মিজানুর রহমান পাটোয়ারী। প্রধান শিক্ষক হলেও তিনি প্রতিদিন ক্লাস নিতেন। একদিন ক্লাস সিক্সে ক্লাস নেয়ার সময় তিনি খেয়াল করেন, একটা কুকুর বসে আছে ক্লাসরুমের সামনে। খুব মনোযোগ দিয়ে কুকুরটা তার কথা শুনছে। ব্যাপারটা তিনি তেমন পাত্তা দিলেন না।

পরের দিন তিনি আবার ক্লাস নিতে গিয়ে ওই একই কাণ্ড দেখেন— কুকুরটা পেছনের দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের দুই পা সমান রেখে বসে কথা শুনছে তার। মাঝে মাঝে জিভ বের করে লালাও ফেলছে সে।'

'কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়েছিল নাকি?' বাবা জিজ্ঞেস করেন।

'না। কুকুরটা সুস্থ-সবল ছিল।'

'কুকুরটা কি কারো পোষা কুকুর ছিল?' মনু আপা বলে।

'না। ওটা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা কোনো কুকুর ছিল।'

'তারপর?' লুবা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তারপর এভাবে প্রতিদিন কুকুরটা ক্লাসের সামনে বসে থাকে। প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান পাটোয়ারী সাহেবও ব্যাপারটা আর তেমন খেয়াল করেন না। ভাবেন, এটা কুকুরের একটা স্বভাব।

একদিন প্রধান শিক্ষক সাহেব ক্লাসের ছাত্রদের বলেন, তোমরা একটা কাজ কখনো করবে না।

ক্লাসের একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করে, কোন কাজটা, স্যার?

চুরি করবে না।

ক্লাসের সব ছাত্র একসঙ্গে বলে ওঠে, জি স্যার।

তোমরা আরেকটা কাজও কখনো করবে না।

আরেক ছাত্র জিজ্ঞেস করে, কোন কাজটা, স্যার?

মিথ্যা কথা বলা।

ক্লাসের সব ছাত্র একসঙ্গে বলে ওঠে, জি স্যার।

তার মানে, তোমরা কখনো কোনো অন্যায় করবে না। কারণ অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতে হয়। সেই শাস্তিটা অনেক রকম হতে পারে।

প্রধান শিক্ষক সাহেবের কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা হঠাৎ কথা বলে উঠল, স্যার, আপনি নিজেও তো অনেক অন্যায় করেছেন!

কে কথা বলল? প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

স্যার আমি। ওদিকে না, আপনি বাইরের দিকে তাকান।

ক্লাসের সবাই বাইরের দিকে তাকাল। কুকুরটা জিভ নেড়ে নেড়ে প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান পাটোয়ারীকে বলল, এই স্কুলের ছাত্রদের নামে অনুদান হিসেবে কিছু টাকা এসেছিল। এই স্কুলের অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব আর আপনি মিলে টাকাটা মেরে দিয়েছেন। কিন্তু সবাইকে বলেছেন অন্য কথা। তার মানে, আপনি চুরি করেছেন, মিথ্যা বলেছেন এবং অন্যায় করেছেন। আপনারও শাস্তি পাওয়া উচিত। বলেই কুকুরটা লাফ দিয়ে প্রধান শিক্ষকের গলাটা কামড়ে ধরে। তারপর তাকে রক্তাক্ত করে চলে যায় কোথায় যেন।'

'প্রধান শিক্ষক সাহেব কি মারা গিয়েছিলেন?' মিতি চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে আমাকে।

'না, সেটা জানা যায়নি।'

'কুকুরটাকে কি পরে আবার দেখা গেছে?' বাবা জিজ্ঞেস করেন।

'সেটাও জানা যায়নি।' সবার দিকে আমি আরো একবার তাকাই। সবার মাঝেই এক ধরনের মুগ্ধতা ও উৎকণ্ঠা। মনটা আনন্দে নেচে ওঠে আমার। যাক, এ জীবনে আর কিছু করে খেতে না পারি, গল্প বলে জীবনটা চালিয়ে নিতে পারব। জীবন বাঁচাতে অনেকেই তো অনেক কিছু করে, আমি করলে দোষ কী?

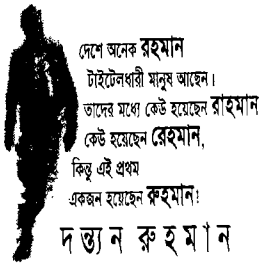

অর্পা আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'কদিন আগে বাবা আমাদের আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম আমরা। কিছু প্রাণী দেখলাম সেখানে, আপনি হাসলে আপনাকে যেমন দেখায়, প্রাণীগুলোও দেখতে ঠিক সে রকম।'

কোনো রকম অবাক হলাম না আমি। অর্পা এ রকমই। ওর সঙ্গে যতবার আমার দেখা হয়েছে, ততবার ও এভাবেই কথা বলেছে। অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। ঝট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'তাই নাকি!'

আগের মতোই হাসতে হাসতে অর্পা বলে, 'হ্যাঁ।'

'ওগুলো তো বোধহয় পুরুষ-প্রাণী ছিল, মেয়ে-প্রাণীগুলো নিশ্চয় একটু অন্য রকম দেখায়।'

'অন্য রকম কেন?'

'আপনি হাসলে আপনাকে যেমন দেখায়, মেয়ে-প্রাণীগুলোকেও তো তেমনই দেখানোর কথা, তাই না?'

সরু চোখে তাকাল অর্পা আমার দিকে। আমি সেটাকে পাত্তা না দিয়ে বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললাম, 'বাসায় এ মুহূর্তে কে কে আছে?'

'কেন?'

'কারণ আছে।'

'কেউ না, আমি একা। বাইরে কেয়ারটেকার আছে।'

'মোখলেস ভাই? মোখলেস ভাইয়ের সঙ্গে তো কথা বলেই এলাম।' ঘরের চারপাশে তাকিয়ে আমি বললাম, 'অর্পা আর আঙ্কেল কই?'

'পিজা আনতে গেছে।'

'কখন গেছেন?'

'এই তো সন্ধ্যার পরপরই গেল।'

'আপনি গেলেন না?'

'আমার যেতে ইচ্ছে করেনি।'

'ভালোই হলো।' আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'চলুন, আপনার ঘরে চলুন।'

'আমার ঘরে কেন?'

'কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'সেটা তো এখানে বলা যাবে না।'

'কাজটা এখানে করা যায় না?'

'যায়, তবে তেমন ভালো হবে না।' আমি অর্পার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'আপনার আপত্তি থাকলে থাক।'

অর্পা একটু ভেবে বলল, 'না, চলুন।'

প্রতিটা আধুনিক মেয়ের রুমেই মিষ্টি একটা গন্ধ থাকে। এর আগে চৈতীর রুমে দেখেছি, কবিতার রুমে দেখেছি। অর্পার রুমটাও ঠিক একই রকম। কী অদ্ভুত সুন্দর করে গোছানো! কোনো জিনিস ছুঁতে ইচ্ছে করে না, যদি নষ্ট হয়ে যায়!

অর্পা কনফিডেন্টলি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার বলুন, কাজটা কী?'

দুষ্টুমির একটা হাসি মুখে এনে আমি অর্পার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

একপলক অর্পা আমার দিকে তাকাল। তারপর কোনো কথা না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

'এবার জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দিন, যেন বাইরে থেকে কোনো শব্দ বা আলো ঘরে না আসতে পারে।' আবার অর্পার দিকে তাকাই আমি। অর্পা এবারও কোনো কথা বলে না, জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দেয়।

'এবার ঘরের লাইটটা বন্ধ করতে হবে যে।'

কিছুটা চোখ বড় বড় করে অর্পা আমার দিকে তাকায়। আমি মাথাটা একটু কাত করে বলি, 'জি, ঘরের লাইটটা বন্ধ করতে হবে।'

সম্মোহিতের মতো অর্পা দেয়ালের কোনায় গিয়ে লাইটটা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! চমৎকার, এমন অন্ধকারই

দরকার। অর্পা?'

'জি।' কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনায় অর্পার গলাটা।

'ওখান থেকে সরে এবার আমার কাছে আসুন।'

'জি।' আগের চেয়ে কাঁপা কাঁপা শোনায় অর্পার গলা।

'আপনাকে কাছে আসতে বলেছি আমি।'

অর্পা এলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আমি খুব উদার গলায় বললাম, 'কোনো কাজেই সংকোচ থাকতে নেই, যদি সেই কাজের অর্ধেকটা ইতিমধ্যে আপনি করে ফেলেন।'

অর্পা তবু এলো না। আমি এবার একটু চড়া গলায় বললাম, 'কই, আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন!'

ভয় পাওয়া মানুষের হাঁটার মতো পা ঘষে ঘষে কাছে এলো অর্পা। তবে আমার থেকে বেশ দূরেই থেমে গেল সে। তা দেখে আমি বললাম, 'উঁহু, অত দূরে থাকলে তো চলবে না। আপনাকে আরো কাছে আসতে হবে।'

কাছে এলো না অর্পা। আমি খুব নরম গলায় বললাম, 'কী হলো, কাছে আসছেন না কেন আপনি!'

অর্পা আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল। এবার আমিই এক কদম এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনি আসলে কী বলুন তো! ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আরো কাছে আসুন, আরো কাছে...।'

দ্বিধাযুক্ত পায়ে অর্পা আমার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল, খুব কাছে। আমি স্পষ্ট ওর হৃদ্‌যন্ত্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটু একটু কাঁপছেও ও। আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলার মতো করে বললাম, 'আমার হাতের দিকে তাকান। আমি নতুন একটা ঘড়ি কিনেছি। দেখুন দেখুন, অন্ধকারে ঘড়ির ভেতরটায় কী সুন্দর আলো জ্বলে!'

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে অর্পা লাইটটা জ্বালিয়ে দিল। আমি আগের মতোই দুষ্টুমির হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। মাথা নিচু করে আছে ও। দাঁড়িয়ে আছে কেমন নিথর হয়ে, সারা মুখ ঘেমে একাকার।

ধীর পায়ে আমি অর্পার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর আগের মতোই কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'এবার আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে যে।'

'কী!' বেশ চমকে ওঠে অর্পা।

'ঘরের দরজা আর জানালাগুলো খুলে দিন।' কিছুটা শব্দ করে হাসতে

হাসতে বলি আমি।

'খুব কষ্টের পর হাসি'র মতো একটা হাসি দিয়ে দরজা-জানালাগুলো খুলে দিল অর্পা। আমি বললাম, 'চলুন, এবার ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসি। কেউ এসে আমাদের দুজনকে এ রুমে দেখলে অনেক গল্প আসতে পারে তাদের মাথায়।'

ড্রয়িং রুমে এসে ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়ল অর্পা। ওর ঘোর এখনো কাটেনি। আমি পাশের সোফায় বসে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম ওর দিকে তাকিয়ে।

ইদানীং মানুষকে অবাক করে দিতে বেশ ভালো লাগে। সেটা কথা বলে হোক কিংবা কোনো কাজ করে। প্রকৃতি নিজেই আমাদের মুহূর্ত মুহূর্ত অবাক করে দেয় তো!

বাবাও আমাদের মাঝে মাঝে অবাক করে দেন। কোনো কোনো দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, আমরা মাছের মুখ দেখি না। শুধু আলুভর্তা, ডাল কিংবা কোনো একটা সবজি দিয়ে ভাত খেয়ে নিই আমরা। আল্লাহর কসম, এতে আমাদের একদম খারাপ লাগে না। বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের। ইদানীং মাসের শেষে, যেদিন বেতন পায়, সেদিন অফিস থেকে ফেরার সময় কিছু মাছ কিনে নিয়ে আসে আপা বাসায়। আমরা সেদিন তৃপ্তিভরে ভাত খাই। আমি খেয়াল করেছি, মা সেদিন ভাত একটু বেশি করে রান্না করে। আমরা সবচেয়ে অবাক হই, যেদিন বাবা হঠাৎ করে বড় একটা মাছের টুকরো কিনে আনেন। মাছটা বাসায় আনার পর থেকেই বাবার চোখেমুখে সেকি আনন্দ! পরম যত্ন নিয়ে মাছটা কাটতে থাকে মা, আমরা গোল হয়ে বসে সেই মাছ-কাটা দেখি, বাবা একটু পরপরই মাকে বলে ওঠেন—জাহানারা, এভাবে কাটো তো, ওভাবে কাটো তো। মা অনেক সময় বাবার ওপর বিরক্ত হয়, কিন্তু এই সময়টাতে মা একদম বিরক্ত হয় না। বাবা যা বলেন, শুনে যায় নীরবে। বাবার মুখটা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমি তখন বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে তাকে অবাক করে দিয়ে বলি, 'বাবা, এই যে আজকে তুমি মাছের একটা টুকরো কিনে আনলে, এর জন্য তোমার সাড়ে সাত মাইল দূরের অফিসটায় কত দিন হেঁটে যেতে হয়েছে?'

বাবা কিছু বলেন না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে, অনেকক্ষণ। আমার সমস্ত ভালোবাসা একত্র করে বাবার কাঁধে আমি আমার একটা হাত রাখি। বাবা আলতো করে মাথাটা কাত করে দেন আমার হাতের

দিকে।

মাথাটা এখনো নিচু করে আছে অর্পা। আমি অর্পার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলি, 'একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কেন ভালোবাসে, জানেন?'

চোখ তুলে তাকায় অর্পা, মাথাটা এদিক-ওদিক করে।

আমি অর্পার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'কৌতূহল মেটাতে।' আমি একটু থেমে বলি, 'কদিন পর সেই ভালোবাসাটা কেটে যায় কেন, জানেন?'

অর্পা আবারও মাথা এদিক-ওদিক করে।

'ব্যাপারটা বোগাস, এটা জানতে পেরে।' আমি আরো একটু থেমে বলি, 'আরো কদিন পর মানুষটা আবার ভালোবাসতে চায় কেন?'

ফ্যালফ্যাল করে অর্পা আমার দিকে তাকায়। এটাও জানে না সে।

আমি বলি, 'অভ্যাসের কারণে।'

ঝনঝন করে ঘরে ভেতর ঢুকল অর্ণা। আমাকে দেখেই পাশে বসে বলল, 'কদিন আগে আমরা আফ্রিকায় গিয়েছিলাম, আপু বলেছে?'

'বলেছে।'

'আর কিছু বলেছে?

'হ্যাঁ, বলেছে।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে, তুমি যখন হাসো, তখন নাকি মনে হয় মানুষ আগে বানরই ছিল। আর যখন রাগো, তখন মনে হয় মানুষ এখনো বানরই আছে।'

'আপু আপনাকে তাই বলেছে?'

'বিশ্বাস না হলে তোমার আপুকে জিজ্ঞেস করো!'

অর্ণা অর্পার দিকে তাকাতেই অর্পা বলল, 'আব্বু কই?'

'নিচে আছে, আসছে।' অর্ণা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওই তো আব্বু এসে গেছে।'

কিছুটা ঢুলতে ঢুলতে ঘরের ভেতর ঢোকেন বদিউল আঙ্কেল। তার পেছন পেছন মোখলেস ভাই। মোখলেস ভাইয়ের দু হাতে দুটো রঙিন বোতল। বোতল দুটো নিয়ে দ্রুত আঙ্কেলের রুমে চলে গেল মোখলেস ভাই। আমাকে দেখেই আঙ্কেল থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আরে দস্যুন, তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথায় খুঁজিনি তোমাকে! সব জায়গায় খুঁজেছি, দুনিয়ার সব জায়গায় খুঁজেছি। শুধু সমুদ্রের নিচে খোঁজা হয়নি তোমাকে। আরো দুটো জায়গায় খোঁজা হয়নি—চাঁদে আর মঙ্গল গ্রহে। তা তুমি ভালো

আছ?'

আমি কিছু বলার আগেই অর্পা ঝট করে সোফা থেকে উঠে বলল, 'বাবা, তোমাকে না বাইরে গিয়ে ওসব ছাইপাশ ছুঁতে নিষেধ করেছি?'

'রাইট। তুই নিষেধ করেছিলি। আমিও ভদ্রলোকের বাচ্চার মতো ওসব ছুঁতে চাইনি। কিন্তু রাস্তার মাঝে হঠাৎ আমার বন্ধু, শুয়োরের বাচ্চা সাহেদের সঙ্গে দেখা। ওই শালাই তো আমাকে টেনে নিয়ে গেল জোর করে।' আঙ্কেল নিজের মাথায় নিজের একটা হাত রেখে বলেন, 'এই আমার মাথার কসম, এক শ পার্সেন্ট কসম!'

'তুমি নিজে থেকে যাওনি?'

'এটা কী বললি রে মা। আমি যখন বাসা থেকে বের হই, তখন ওই ছাইপাশের দোকানগুলো আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকে—আয় বদি, বদি আয়; আয় বদি, বদি আয়...। কিন্তু আমি ঘৃণাভরে ওদের সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করি। বিশ্বাস কর মা, বিশ্বাস কর।'

'যাও, ঘরে যাও।'

'ঘরেই তো যাব। ওটাই তো আমার এখন সব।' আঙ্কেল আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'দন্ত্যন, তুমিও আমার ঘরে আসো। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

'না, উনি যাবেন না। তুমি যাও।'

'ওর সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে রে মা।'

'উনি এখন আমার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'গল্প তো আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না রে মা! কিন্তু জরুরি কথাটা আমাকে ওর কাছে আজ বলতেই হবে। একটা শুভ সংবাদ ওকে আজ আমি দেব, মহা শুভ সংবাদ।' আঙ্কেল আমার হাত টেনে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্পা আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'বাবা, আমি কিন্তু মাইন্ড করছি।'

'ঠিক আছে, আমিও মাইন্ড করলাম। মাইন্ড করে আমি এখন বমি করব। তোর চৌদ্দগুষ্টি এসে তারপর আমার সেই বমি পরিষ্কার করবে, তুইও করবি।' কথাটা বলে ওয়া ওয়া করতে থাকেন আঙ্কেল। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে তার, এই বমি করলেন বলে। তার আগেই অর্পা টেনে নিয়ে গেল তাকে বাথরুমের ভেতর।

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দন্তান রুহমান

মিতি আমাকে দেখেই ছোটখাটো একটা চিৎকার দিয়ে বলল, 'তোর ঘরে ওটা কী দেখলাম, ভাইয়া?'

'কী দেখেছিস?'

'ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে তোর খাটের নিচে একটা ব্যাগ দেখলাম।' চোখ বড় বড় করে ফেলেছে মিতি।

'তো?'

'ব্যাগের ভেতর ওসব কী?'

'তুই চিনিস না ওগুলো কী?'

'চিনি তো।'

'তাহলে?'

'তুই এত টাকা কোথায় পেলি ভাইয়া! বান্ডিল বান্ডিল টাকা, এত টাকা কোনো দিন একসঙ্গে দেখিনি! আমার তো বুক কাঁপছে ভাইয়া।' মিতি কথা বলতে বলতে হাঁপাতে থাকে। আমি ওর হাত ধরে আমার ঘরে নিয়ে আসি। তারপর আমার ব্রিটিশ পিরিয়ডের কালচেটে খাটের নিচ থেকে বের করে আনি ব্যাগটা। মিতি আগের মতোই চোখ দুটো বড় বড় করে রেখেছে। আমি ওর হাতে ব্যাগটা দিয়ে বলি, 'বাবা এসেছেন অফিস থেকে?'

মিতি অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'হ্যাঁ।'

'বড় আপা?'

'হ্যাঁ।'

'তুই এখানে একটু চুপ হয়ে বসে থাক, আমি আসছি।'

বাবা, মা, মনু আপা, লুবাকে ডেকে আনি আমার ঘরে। তারপর মিতির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে চেইনটা খুলে ফেলি সেটার। সবার সামনে সেটা মেলে ধরতেই লুবা আনন্দ নিয়ে বলে, 'এত টাকা!'

মনু আপা আর মা কিছু বলে না। কেবল বাবা খুব নির্ভারভাবে টাকাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন, 'নতুন টাকা তোমরা কখনো শুঁকে দেখেছ? যদি না দেখে থাকো তাহলে শুঁকে দেখো। দেখবে, নতুন টাকার গন্ধ কিছুটা পচা মাংসের মতো, উৎকট। টাকা যখন এর হাতে-ওর হাতে গিয়ে পুরোনো হয়ে যায়, তখন আরেক ধরনের গন্ধ হয়। এটাও উৎকট। মোট কথা টাকা মানেই হচ্ছে গন্ধ। তোমরা দেখো না, যাদের অনেক বেশি টাকা হয়ে যায়, টাকার সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের জীবনটা কেমন গন্ধময় হয়ে যায়, তারা কেমন অসৎ হয়ে যায়, দুর্নীতিবাজ হয়ে যায়, তারা কেমন অমানুষ হয়ে যায়!'

'খুব সত্য কথা বাবা।' মনু আপা খুব ছোট্ট করে বলে।

ঝট করে আমি মনু আপার দিকে তাকাই। মাথা নিচু করে ফেলে মনু আপা এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোঁৎ করে। আমি বাবাকে বলি, 'টাকাগুলো কার, আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না, বাবা?'

'না।'

'কেন?'

'যে জিনিসটার প্রতি কোনো আসক্তি নেই আমার, সেটা কার বা কোথাকার, তা আমার জানতে ইচ্ছে করে না।'

মা একটু নড়েচড়ে বসে বলে, 'টাকাগুলো কার, নজির?'

'রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি মা। ঠিকানাও পেয়েছি। আজ রাতেই ফেরত দিয়ে আসব। যদিও এর আগে একবার ফেরত দিতে গিয়েছিলাম, বাসায় তালা লাগানো ছিল তাদের।'

'একটু তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে এলে ভালো হয়।' বলেই বাবা চলে যান আমার ঘর থেকে।

লুবা কিছুটা উশখুশ করে বলে, 'ভাইয়া, সব টাকাই ফেঁরত দিবি?'

'কেন, তুই কি কিছু রেখে দিতে চাস?' হাসতে হাসতে বলি আমি।

'নাহ্।'

'তাহলে ওই কথা বললি কেন?'

'এমনি।' লুবা কেমন যেন লজ্জা পেয়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মাও বের হয়ে যায়। একটু পর মিতি ব্যাগের চেইনটা বন্ধ করে সেটা রেখে দেয় খাটের নিচে। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে, 'ভাইয়া, বাইরে যাওয়ার আগে আমার একটা কথা শুনে যাস। প্লিজ।'

মনু আপা এখানো বসে আছে আমার খাটের ওপর। আমি সরে এসে একটু কাছ ঘেঁষে বসি। তারপর আপার একটা হাত ধরে বলি, 'তুমি আমার সঙ্গে ইদানীং একটু কম কথা বলো আপা।'

'শুধু তোর সঙ্গে না, সবার সঙ্গেই একটু কম কথা বলি।' আপা আমার হাতটা চেপে ধরে।

'কেন?'

'জানি না।'

'আপা— ।' আমি একটু চুপ থেকে বলি, 'প্রতিদিন যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন বেশ ভালো থাকি। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই অপরাধবোধে ভুগতে থাকি আমি। তখন যে কেমন লাগে আপা, যদি বোঝাতে পারতাম!'

'অপরাধ তো আমার, তুই কেন অপরাধবোধে ভুগছিস?'

'অপরাধটা তুমি কার জন্য করেছ?'

'তোর লেখাপড়ার জন্যই করেছিলাম।'

'সেই লেখাপড়াটাও আমি করলাম না।'

আপা একটু চুপ থেকে বলে, 'লেখাপড়া না করিস, রাস্তায় রাস্তায় এভাবে না ঘুরলে হয় না?'

'সম্ভবত এটা আর আমি ছাড়তে পারব না আপা। আমাদের এই বাসায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেই কেমন যেন চক্কর দিয়ে ওঠে মাথাটা। তখন আর বাইরে ঘোরাঘুরি করা ছাড়া আমার আর কিছু ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি কোনো দিন এই বাসাটায় ফিরতে না হতো আমার।'

'পারবি তুই?'

'পারি না বলেই তো ফিরে আসি।'

আপা আর কিছু বলে না, আমিও না। নিশ্চুপ কেটে যায় আমাদের বেশ কিছু সময়। কেবল ঘরের টিকটিকিগুলোর শব্দ শুনতে থাকি আমরা মনোযোগ দিয়ে।

বহুদিন, বহুদিন পর পলক, রিছিল আর বিপ্লবের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই তিনজন প্রায় একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দন্ত্যন, তুমি!'

মুখটা উজ্জ্বল করে আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি। যথারীতি রাতে ঘুরতে বের হয়েছি। তবে আজ একটা কাজ নিয়ে বের হয়েছি। তোমরা কি আজ ব্যস্ত, না একটু সময় হবে?' তিনজনের দিকে তাকাই আমি।

'সময় হবে না মানে! যত ব্যস্ততাই থাক, আজ সব বাদ। আজ আমরা সারা রাত তোমার সঙ্গে ঘুরব।' রিছিল বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলে। এরই মধ্যে পলক আমার কাঁধের টাকাবোঝাই ব্যাগটা খুব স্বাভাবিকভাবে ওর কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। বিপ্লব আমার একটা হাত চেপে ধরে আছে শক্ত করে।

এই যে এত আন্তরিকতা, এত সৌহার্দ্য—অথচ ওরা আমার কেউ না, অন্তত রক্তের কেউ না। নীলক্ষেত থেকে এলিফ্যান্ট রোডে যাওয়ার সময় এক রাতে পরিচয় হয়েছিল ওদের সঙ্গে। ওরা তখন ছিনতাইকারী ছিল, ওরা আমার কাছ থেকে ছিনতাই করতে এসেছিল। অনেক কথা-বলাবলির পর আমি রিছিলের একটা হাত চেপে ধরে বলেছিলাম, 'চলুন, আজ আমরা সারা রাত হাঁটব আর গল্প করব। আপনি আপনার গল্প বলবেন, আমি আমার গল্প বলব, পলক পলকের গল্প বলবে, বিপ্লব বিপ্লবের গল্প। চাঁদটা ঢেকে আছে, একটু পর জ্যোৎস্নাভরা সেই চাঁদটা আবার ভেসে উঠবে, আমরা তাকে সাক্ষী রেখে আমাদের দুঃখের কথাগুলো বলব। স্রষ্টা বসে আছেন চাঁদের ওই আশপাশেই, চাঁদ মামা আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে আমাদের দুঃখের কথাগুলো একসময় জানিয়ে দেবে স্রষ্টাকে। আর স্রষ্টা যদি একবার আমাদের কষ্টের কথাগুলো জানতে পারেন, তাহলে আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। দেখেন, আমি দিব্যি বলছি একদম থাকবে না।'

রিছিলের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠেছিল সেদিন। আমি রিছিলের চোখের দিকে তাকিয়ে আরো বলেছিলাম, 'আপনারা হয়তো একটা অন্যায় করার জন্য এই রাস্তায় নেমেছেন, খুব সামান্য কিছু পেতে পারেন তাতে। কিন্তু সকাল থেকে এরই মধ্যে আমাদের দেশে ঘটে গেছে অনেক অন্যায়। রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে চুরি হয়ে গেছে কয়েক কোটি টাকা, ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আরো কয়েক কোটি টাকা, সম্পদ পাচার করা হয়েছে, লুণ্ঠন করা হয়েছে, দখল করা হয়েছে পতিত জমি। আরো শুনবেন?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রিছিল বলেছিল, 'না। আমরা জানি।'

'আপনারা জানেন, আমি জানি, অনেকে জানে। কিন্তু তবু প্রতিদিন একই অন্যায় ঘটে যাচ্ছে। কিছুই বলছি না আমরা।'

'বলে কী হবে?' অভিমানী গলায় বলেছিল পলক।

'আজ হবে না, কাল হবে না, কিন্তু পরশু ঠিকই হবে।'

মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে আসা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিপ্লব হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'চারদিকে এত অন্যায়, এর পরও চাঁদ আমাদের আলো দেয়,

গাছ আমাদের ছায়া দেয়, প্রতিদিন গোলাপ ফোটে, নদী বয়ে যায় অবিরত।'

'তারপর?' আমি বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বিপ্লব আর কিছু বলেনি, কেউই কিছু বলেনি। রূপকথার গল্পের মতো মুগ্ধ করা গল্প বলতে বলতে আমরা হাঁটতে থাকি। আমাদের হেঁটে বেড়ানো আর শেষ হয় না। একসময় আমরা লক্ষ করি, আমরা হাঁটছি, চাঁদ হাঁটছে, সমস্ত পৃথিবী হাঁটছে। আমরা সবাই একসঙ্গে হাঁটছি। জ্যোৎস্নাধোয়া এ পথ ধরে হাঁটতে আমাদের কোনো ক্লান্তি লাগে না।

আজও আমরা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে পলক বলে, 'ব্যাগের ভেতর কী আছে, দন্ত্যন? বেশ ভারী তো!'

'গুপ্তধন।' বলেই ওর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিতে চাই। পলক দিতে চায় না। কিছুটা জোর করেই নিই আমি।

মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে আমার। পকেট থেকে বের করে রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে জিনিয়া সামাদ বলেন, 'দন্ত্যন, আমি, জিনিয়া সামাদ বলছি, জার্মানি থেকে।'

'বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম।'

'কী বললে! ম্যাডাম-ট্যাডাম বলতে নিষেধ করেছি না তোমাকে!'

'জি।'

'তাহলে?'

'আপনাকে কী বলে সম্বোধন করব, সেটাই তো খুঁজে পাই না আমি। আপনি ভালো আছেন?'

'আছি। তুমি?'

'আমি ভালো আছি।'

'কী করছ এখন?'

'আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রাস্তা দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছি। একটা কারণ অবশ্য আছে।'

'কারণটা বলা যাবে?'

'বলা যাবে। সম্ভবত কয়েক লাখ টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি আমি। সেগুলো ফেরত দিতে যাচ্ছি।'

'কাকে ফেরত দেবে?'

'টাকার সঙ্গে দুইটা পাসপোর্ট পেয়েছি। পাসপোর্টে ঠিকানা লেখা আছে।'

'একটা কথা বলি তোমাকে?'

'জি, বলুন।'

'টাকাগুলো তোমার নিতে ইচ্ছে করেনি?'

'না।'

'একটুও না?'

'একটুও না।'

জিনিয়া সামাদ একটু থেমে কী যেন ভেবে বললেন, 'তুমি এত ভালো কেন, দন্ত্যন?'

'প্রশ্নটা আমারও। আমি এত অচল কেন?'

'তুমি অচল?' জিনিয়া সামাদ গলাটা গম্ভীর করে বলেন, 'এবার দেশে এসে তোমাকে বুঝিয়ে দেব মানুষের ডেফিনিশন কী? তার আগে তুমি ভালো থেকো। ও, ভালো কথা, তোমার মোবাইল সেটটা ঠিক আছে তো?'

'আপনি যেভাবে দিয়ে গেছেন ঠিক সেভাবেই আছে।'

'দন্ত্যন, আজ তাহলে রাখি। শুভ রাত্রি।'

সংসদ ভবনের সামনে দিয়ে আড়ংয়ের সামনে আসতেই তিনজন পুলিশ এসে সামনে দাঁড়াল। মোটামতো পুলিশটা একটু এগিয়ে এসে আমাকে বলল, 'ব্যাগে কী?'

'নিশ্চয় কিছু একটা আছে।'

'কী আছে?'

'সেটা তো আপনাকে জানাতে বাধ্য নই আমি।'

'বাধ্য নই মানে?'

'থানা থেকে আপনাকে বলা হয়নি, রাস্তা দিয়ে ব্যাগে করে কে কী নিয়ে যাচ্ছে তা জিজ্ঞেস করতে। আপনাকে বলা হয়েছে মানুষের নিরাপত্তা দিতে, কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেটা খেয়াল রাখতে। ব্যাগে করে কিংবা বস্তায় করে কে কী নিয়ে যায়, এটা দেখার জন্য আলাদা পুলিশ আছে। আর একটা কথা, ধমকিয়ে কথা বলবেন না। র‍্যাবের বড় অফিসারও আমার সঙ্গে ধমকিয়ে কথা বলেন না। তার সঙ্গে আমার ইয়ার্কি-ঠাট্টার সম্পর্ক।'

'ইয়ার্কি-ঠাট্টার সম্পর্ক মানে?'

'ইয়ার্কি-ঠাট্টার সম্পর্ক মানে ইয়ার্কি-ঠাট্টার সম্পর্ক। ওই সারাহ পলিন আছে না, তাকে নিয়েও তার সঙ্গে কথা হয়?'

'সারাহ পলিনটা আবার কে?'

'আপনাদের নিয়ে এই একটা মুশকিল! আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের চেনেন

না। ওই যে আমেরিকায় ভোটের সময় বারাক ওবামার অপজিশন লোকটার সঙ্গে যে সুন্দরী মহিলাটা থাকতেন, তিনিই সারাহ পলিন।'

'র‍্যাব স্যারের সঙ্গে ওই মহিলাকে নিয়ে আপনার কী কথা হতো?'

'কী কথা হতো না তাই বলেন। আমি প্রায়ই বলতাম, যদি সারাহ পলিন রাজি থাকতেন, তাহলে ওনাকে নিয়ে একটা বাংলা সিনেমা বানাতাম। সিনেমার নাম দিতাম কী, জানেন?'

'কী?'

'সুন্দরী কেন বাংলাদেশে।'

'র‍্যাব স্যারের সঙ্গে আপনি এসব কথা বলতেন! আপনার সাহস তো কম না!'

'এখানে সাহসের কী আছে! উনি আমার খালাতো বোনের দেবর, আমার বেয়াই। বেয়াইয়ের সঙ্গে কথা বলতে আবার সাহস লাগে নাকি!'

'অনেক প্যাচাল পেরেছেন, এবার থানায় চলেন। আপনারা চারজন একসঙ্গে চলেন।'

'থানায় যাব কেন?'

'আপনার ব্যাগ চেক করব।'

'ব্যাগ চেক করার কী আছে?'

'ব্যাগের ভেতর বোমা থাকতে পারে।'

'আপনাদের নিয়ে আরেকটা মুশকিল হলো, যার কাছে আসল জিনিস থাকে, তাকে খুঁজে পান না। খুঁজে পান শুধু সাধারণ নিরীহ মানুষ।'

'তুই তো বেশি কথা বলছিস।'

'ভাইজান, আপনি থেকে তুইতে নেমে এলেন? ভালো, খুবই ভালো। আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

মোটা পুলিশটা খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'চল, থানায় গেলে আরো বেশি সম্মানিত বোধ করবি।'

'চলেন।'

তিন-চার পা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাদা গাড়ি এসে থামে আমাদের পাশে। আমরা গাড়ির দিকে তাকাই। গাড়ির দরজাটা খুলে সাব-ইন্সপেক্টর নাজনীন আমাকে বলেন, 'কী হয়েছে, দন্ত্যন?'

পুলিশটা আমার হাতটা ছেড়ে দেয়। আমি হেসে হেসে বলি, 'কই, কিছু না তো! উনি আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন।'

'কেন?'

'ওনার স্ত্রী নাকি ভালো-মন্দ কী রান্না করে দিয়েছেন, আমাদের সবাইকে সেটা খাওয়াবেন।'

পুলিশটি সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর নাজনীনকে বলেন, 'একদম মিথ্যা কথা ম্যাডাম। সন্দেহজনকভাবে এই ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঘুরছিল এই ছোকরা চারজন। আমাদের মনে হয়েছে ব্যাগে নাশকতামূলক কিছু আছে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করি, ও কিছু বলে না। খালি আবোল-তাবোল বলে।'

'আবোল-তাবোল কী বলে?'

'অত কি আর মনে আছে ম্যাডাম?'

নাজনীন ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটা সেই ব্যাগ না?'

'জি।'

'কী আছে এর ভেতর?'

'টাকা।'

'টাকা! কার টাকা?'

'ঠিকানা পেয়েছি, যার টাকা তাকে ফেরত দিতে যাচ্ছি।'

'ফেরত দিতে যাচ্ছেন—।' নাজনীন ম্যাডাম মুচকি হেসে বলেন, 'অনেক দিন পর একটা ভালো কাজের কথা শুনলাম। যে প্রফেশনে আছি, এখানে কেবল খারাপ মানুষদের কারবার, ভালো মানুষ খুব কমই দেখা যায়, ভালো কাজের কথা তো শোনাই যায় না। খুব ভালো লাগছে আমার দন্ত্যন, খুব ভালো লাগছে। আমরা কি কোথাও এক কাপ চা খেতে পারি?'

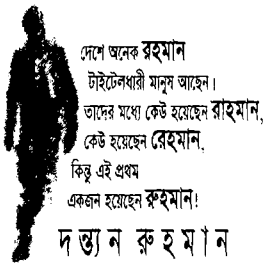

বাসাটায় আজও তালা লাগানো। আজও আশপাশের কেউ কিছু বলতে পারল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। টাকাটা দ্রুত ফেরত দেওয়া দরকার। ব্যাগটা এখন আমার বোঝা মনে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাঁধ থেকে এটা নামিয়ে ফেলতে পারলেই বাঁচি।

রিছিল একটু এগিয়ে এসে আমার পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'এখন কী করবে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'এতগুলো টাকা, কাঁধে নিয়ে ঘোরাও তো রিস্কি!'

'রিস্ক-টিস্কের কথা আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি ওই ফ্যামিলিটার কথা। এতগুলো টাকা হারিয়ে তারা না-জানি কেমন করছে। অথচ টাকাগুলো ফেরত দেয়ার জন্য আমি সেই কবে থেকে ঘুরছি।'

'আর কোনো ঠিকানা নেই এদের?'

'আছে। সিরাজগঞ্জের একটা গ্রামের ঠিকানা আছে।'

'যাবে নাকি একবার?'

'দেখি, আরো দু-এক দিন দেখি। গেলে একা যাব না, তোমাদের সাথে নিয়ে যাব।'

'কিছু খাওয়াদাওয়া করা দরকার যে।' পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসে পলক বলে, 'পেটের ভেতর চিউ চিউ শব্দ হচ্ছে।'

'আমার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে, কী খাবে বলো?' পলকের দিকে তাকিয়ে বলি আমি।

'খেতে তো ইচ্ছে করছে অন্য রকম কিছু। কিন্তু রাত করে সেটা পাওয়া যাবে কি না বুঝতে পারছি না।'

'অন্য রকম কিছুটা কী?'

'লাউ দিয়ে রান্না করা বোয়াল মাছ। চমৎকার তরকারি। এমন তরকারি দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।'

'হোটেলে এটা পাওয়া যাবে না। হোটেলে তো সব মাছের সঙ্গেই সামান্য একটু ঝোল দেয়, কখনো দু-একটা আলু কিংবা পাকা টমেটোর টুকরো দেয়। লাউ কখনো দেয় বলে আমার মনে হয় না। লাউয়ের দাম বেশি তো। বোয়াল মাছ দিয়ে ভাত খেতে হলে তো কারো বাসায় যেতে হবে।'

'এত রাত করে কার বাসায় যাবে তুমি! আর গেলেই কি সেখানে বোয়াল মাছ পাওয়া যাবে? আবার দেখা গেল বোয়াল মাছ আছে, কিন্তু লাউ নেই। মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে তখন।' পলক কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলে।

'দেখি একটা কিছুর ব্যবস্থা করা যায় কি না। কারওয়ান বাজারে গেলে এখন বোধহয় লাউ আর বোয়াল মাছ দুটোই পাওয়া যাবে।' আমি সবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'এখান থেকে কারওয়ান বাজার কিন্তু খুব বেশি দূরে না।'

বিপ্লব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। যদিও কথা ও একটু কমই বলে। পাশ থেকে সরে এসে ও বলল, 'মাছ, লাউ নাহয় কেনা গেল, কিন্তু রান্না করবে কোথায়? ঝামেলা না?'

'চলো তো, আগে জিনিসগুলো কিনি। তারপর দেখা যাবে।'

কারওয়ান বাজারে এসে কাঁচাবাজারে ঢোকার আগেই বললাম, 'চলো, মাছ আর লাউ কেনার আগে একটা কাজ করি।'

পলক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী কাজ?'

কিছু না বলে কারওয়ান বাজারের মেইন রাস্তার পাশের ফুটপাতে নিয়ে এলাম আমি ওদের। রাত বেশি হয়নি, শত শত লোক বাঁশের টুকরির ভেতর পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে এরা। মাঝরাতে এদের ঘুম ভেঙে যাবে, সারা দেশ থেকে বিভিন্ন কাঁচা সবজি আসবে এই কারওয়ান বাজারে, কাজ শুরু হয়ে যাবে তখন তাদের। সবার দিকে একবার তাকিয়ে আমি বললাম, 'মাঝে মাঝেই আমি কিন্তু এ জায়গাটাতে আসি।'

'কেন?' বিপ্লব জিজ্ঞেস করে।

'এদের দেখি।'

'এদের দেখো!'

'এদের দেখি। হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে আমি অভিজাত এলাকাগুলোতে প্রায়ই যাই। দেখি, জীবনের আকাশছোঁয়া রূপ, আভিজাত্যের

অবাঞ্ছিত মহড়া, গর্ব আর উদ্ধত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইট-পাথরের আবাস।'

'আমরাও দেখি। দেখে দেখে নিজেকে সংকুচিত করে ফেলি। জীবনের কী নিদারুণ পার্থক্য, বিস্তর ফারাক!' রিছিল চোখমুখ শক্ত করে বলে।

'এর চেয়েও বেশি দেখি ঘুমের ওষুধের প্যাকেট। রাস্তার পাশে, ফুটপাতে, ডাস্টবিনে, হাজার হাজার মানুষের ঘুমের ওষুধের খালি প্যাকেট। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নিরাপদ কক্ষ, শুভ্রতা জড়ানো বিছানা আর পাখির পালকের বালিশেও তাদের ঘুম আসে না। কয়েক শ বছরের খাবার কেনার টাকা ব্যাংকে সঞ্চিত করার পরও দুশ্চিন্তায় তাদের রাত কাটে; প্রখর ভূমিকম্পেও অটল থাকবে, এমন ছাদের নিচে তারা নিজেদের অনিরাপদ ভাবে; নিশ্চিন্ত জীবনের সুবাতাসেও তারা জটিলতার গন্ধ পায়।'

'ঠিক। একদম ঠিক বলেছ তুমি, দন্ত্যন।' রিছিল বেশ উৎসাহী হয়ে বলে।

'অথচ দেখো, শিশুর মতো সরলতা আর সুখী মানুষের প্রশান্তিতে এরা কী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে! অনিরাপদ জীবন বাহিত করেও তাদের চেহারায় কোনো খেদ নেই, অভিযোগের চিহ্ন নেই—নিজের প্রতি, অন্য কারো প্রতি, এমনকি স্রষ্টার প্রতি। সবার চেহারায় ঝুলে আছে এক স্বর্গীয় আভা!'

'টুকরির ভেতর আমার খুব শুতে ইচ্ছে করছে।' রিছিল হাসি হাসি মুখ করে বলে।

'আমারও।' পলকও হেসে হেসে বলে।

'আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে শুই।' সবার দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'শোয়ার পর কেমন মনে হয়, জানো?'

'কেমন মনে হয়?' বিপ্লব জিজ্ঞেস করে।

'তোমার মনে হবে সমস্ত আকাশটা তোমাকে ঘিরে রেখেছে, বিশাল বড় একটা মশারির মতো আচ্ছাদিত করে রেখেছে। তারপর মনে হবে, এ পৃথিবীতে তুমি কেবল একা বেঁচে আছ, তুমি একাই শুয়ে আছ সমস্ত আকাশের নিচে। যে আকাশটা গোল হয়ে নেমে এসেছে তোমার চারপাশে, লাখ লাখ নক্ষত্র জ্বলে আছে সেই আকাশে। এ সবকিছুই তোমার জন্য, তোমার জন্যই সব আয়োজন।'

'ছোটবেলায় আমরা মশারির ভেতর জোনাক পোকা ছেড়ে দিতাম, সারা রাত সেই জোনাক পোকাটি মশারির ভেতর জ্বলত আর উড়ত, ইচ্ছে হলেই হাত দিয়ে ছোঁয়া যেত পোকাটা। ব্যাপারটা সে রকম, না?' রিছিল মুখটা

উজ্জ্বল করে বলে, 'এই টুকরির ভেতর শুলেও মনে হবে, এই তো, এই তো আরো একটু হাত বাড়ালেই আকাশটা ছোঁয়া যাবে, টিম টিম করে জ্বলা তারাগুলো ধরা যাবে!'

'চলো, তোমার যখন শুতে ইচ্ছে করছে তাহলে আমরা চারজনই চারটা টুকরিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি।'

'টুকরি পাব কোথায়?' পলক জিজ্ঞেস করে।

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

'কীভাবে?'

'আহ্, দেখোই না!'

চারটা টুকরিতে শুয়ে থাকা চারজনকে ডেকে তুললাম আমি। শার্ট-প্যান্ট পরা আমাদের চারজনকে দেখে ঝট করে উঠে দাঁড়াল চারজন। ঘুমজড়িত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে একজন বলল, 'কী ব্যাপার, স্যার?'

'স্যরি, আপনাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্য। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে দশটা করে টাকা দেব। এর বদলে আপনাদের টুকরিতে আমরা চারজন কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। বেশিক্ষণ না, চার-পাঁচ মিনিট।'

রাজি হয়ে গেল লোকগুলো।

রিছিল সবচেয়ে আগে টুকরিতে উঠতে নিতেই পড়ে গেল। টুকরিতে উঠতে হয় একটু কৌশল করে। না হলে যেকোনো দিকে কাত হয়ে সেটা পড়ে যেতে পারে। টুকরির মালিক চারজন টুকরিগুলো হাত দিয়ে ধরল। অভিজ্ঞ হিসেবে এবার আমি প্রথম ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর আগে আমার কাঁধের ব্যাগটা টুকরির চারজনের হাতে দিতেই পলক ফিসফিস করে বলল, 'ওটা তোমার কাছেই রাখো।'

পলকের পিঠে হাত রেখে আমি ওকে আশ্বস্ত করে বলি, 'বাংলাদেশের অনেক টাকাওয়ালা কিংবা অনেক ক্ষমতাবান লোকের কাছে হয়তো এই টাকাবোঝাই ব্যাগটা দিলে রিস্কি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু আমি জানি, এদের কাছে এটা খুবই নিরাপদ, নিজের কাছে রাখার মতোই নিরাপদ।'

বিপ্লব টুকরিতে পিঠ রেখেই বলে, 'দন্ত্যন, ভয় লাগছে তো।'

'কেন?'

'ফুটপাতে শুয়ে আছি। মাথার পাশ দিয়ে ট্রাক যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, সিএনজি যাচ্ছে। মনে হয় যেকোনো মুহূর্তে গায়ের ওপর এসে পড়বে, পিষে দিয়ে যাবে শরীরটা।'

'না, ওরকম কিছু হবে না। আরাম করে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাও। একটু পর দেখবে নিজেকে দার্শনিক দার্শনিক লাগছে!'

চারজন শুয়ে আছি আমরা। একটু পর খেয়াল করি, লোকজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়াচ্ছে, অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আমরা তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। অনন্ত নক্ষত্ররাজি নিয়ে ভেসে আছে আকাশ, এই তো, এই তো আমাদের চোখের সামনে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, মুঠোর ভেতর চলে আসবে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, মেঘের সারি।

বেশ বড়সড় একটা বোয়াল মাছ কিনেছি আমরা, সঙ্গে দুটো লাউ। সাইজ অনুযায়ী মাছটা অনেক সস্তা হয়েছে। এই সস্তা কেনার কৃতিত্বটা অবশ্য বিপ্লবের। ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই, এত কৌশল করে দামাদামি করতে পারে ও।

মাছটা প্রথমে দাম চেয়েছিল সাত শ পঞ্চাশ টাকা। খুবই বেশি দাম। কিন্তু হাত দিয়ে ইশারা করে আমাদের কাউকে কথা বলতে নিষেধ করল বিপ্লব। তারপর খুব নির্ভারভাবে মাছওয়ালাকে বলল, 'জনাব, কিছু কমানো যায় না?'

'কত?

'বেশি না, অল্প।'

মাছওয়ালা বলল, 'বলেন, কত দিবেন?'

'লজ্জা লাগছে ভাই বলতে।'

'লজ্জা কিসের, মাছ তো আর এমনি এমনি নিতাছেন না।'

'আমাদের কাছে টাকা-পয়সা কম আছে।'

'কত আছে?' উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে মাছওয়ালা।

'সব মিলিয়ে দুই শ পঞ্চাশ টাকার মতো হবে।'

'ওইটা তো মাছের ল্যাঞ্জার দাম।'

বিপ্লব আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ল্যাঞ্জা কী?'

'ল্যাঞ্জা মানে লেজ।'

বিপ্লব চেহারাটা বিমর্ষ করে মাছওয়ালাকে বলল, 'আপনি শুধু লেজটা বিক্রি করবেন?'

'না।'

'তাহলে যাই।'

চলে আসতে নিতেই মাছওয়ালা বলে, 'ঠিকমতো দাম কন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিপ্লব বলল, 'ভাই, সবার পকেট-মকেট হাতিয়ে আরো গোটা পঁচিশেক টাকা হয়তো বের করতে পারব। এর বেশি পারব না।' বলেই চলে আসতে নেয় বিপ্লব।

'ঠিক আছে, আপনি আরো পঞ্চাশ টাকা দেন।'

সবাই ঘুরে দাঁড়াই আমরা। আমি পকেট থেকে পাঁচ শ টাকার একটা নোট বের করে মাছওয়ালাকে দিতেই মাছওয়ালা বলল, 'কই, আপনাদের কাছে নাকি টাকা নাই, কিন্তু পাঁচ শ টাকার নোট তো ঠিকই পকেট থেইকা বাইর করলেন!'

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব বলল, 'মাছটা কি লাভ না করে বিক্রি করলেন ভাই? যদি লাভ কম করে থাকেন তাহলে একটা কথা বলতাম।'

'কী কথা?'

'আপনার বাসার ঠিকানাটা বলেন, মাছটা রান্না করে দু-তিন পিস আপনার বাসায় দিয়ে আসব। রান্না খুবই চমৎকার, আপনি অতি আনন্দ নিয়ে খেতে পারবেন।'

মাছওয়ালা কিছু বলল না। পাথরচোখে সে তাকিয়ে রইল বিপ্লবের দিকে।

কারওয়ান বাজার থেকে বের হয়ে পলক বলল, 'এটা এখন রান্না করব কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আসো। রান্নার ব্যবস্থা করছি আমি। তার জন্য আজিমপুরের দিকে যেতে হবে আমাদের।'

'সে তো অনেক দূর!'

'অনেক দূর না, হেঁটে যেতে আধঘণ্টা লাগবে।'

'বাসে গেলে কী হয়?'

'বাসে গেলে হাঁটা হয় না, না হাঁটলে মানুষ দেখা যায় না। চলো, হাঁটতে হাঁটতে তিন নেতার মাজারের কাছে যাব। সেখানে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমাদের।'

'কার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?' বিপ্লব একটা লাউ বন্দুকের মতো কাঁধে নিয়ে বলে।

'একটা মেয়ের সঙ্গে।'

'মেয়েটা কে?'

'চলো তো, তারপর বলব মেয়েটা কে।'

সোনারগাঁও হোটেলের পাশে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড় করানো। তার ভেতর বেশ কয়েকজন পুলিশ বসা। আমাকে কিংবা আমার হাতে ঝোলানো বোয়াল মাছটা দেখে একজন পুলিশ বলল, 'ওই।'

দাঁড়ালাম না আমি। পুলিশটা আবার ডাক দিল, 'ওই।'

এবার ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। পুলিশটার কাছাকাছি গিয়ে বললাম, 'ভাইজান, সম্ভবত আমাকে ডাকছেন আপনি। আমাদের এলাকায় সাধারণত দুলাভাইদের 'ওই' বলে ডাকা হয়। কিন্তু আমি তো কারো দুলাভাই না, কারণ আমি এখনো বিয়েই করিনি।'

আমার গলার স্বর আর অ্যাটিচুড দেখে পুলিশটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। আর কিছু বলল না।

তিন নেতার মাজারের কাছে এসে পলক বলল, 'ও, মনে পড়েছে। সম্ভবত সোমা নামের কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে আমাদের।'

'সোমাকে তুমি চেনো নাকি?'

'চিনি না, তবে তুমি তার কথা আমাদের একবার বলেছিলে, আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রিছিল বলল, 'হ্যাঁ। ওই যে তাকে একবার রমনার দিকে খুঁজতে এসে তিনজন পুলিশের কাছ থেকে কৌশল করে কিছু টাকা নিয়েছিলাম আমরা।'

বিপ্লব আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে। মেয়েটা সম্ভবত রাস্তায় রাস্তায়ই থাকে, রাস্তার মেয়ে।'

'এই রাস্তার মেয়ে শব্দটা শুনলে আমার খুব খারাপ লাগে বিপ্লব। মেয়েটা কি রাস্তার মেয়ে হয়েই জন্মেছে, না আমার-তোমার মতো কোনো পুরুষ তার সঙ্গে প্রতারণা করে রাস্তার মেয়ে বানিয়েছে তাকে?'

'স্যরি, দস্ত্যন। আমি ওভাবে বলিনি।'

'ওকে। আমি যখনই সুযোগ পাই সোমাকে দেখতে আসি। কখনো পাই, কখনো পাই না। জানো, ওকে দেখলেই আমার বড় বোনের কথা মনে পড়ে আমার। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ একটু হলেও কোনো না কোনোভাবে প্রতারিত, অন্য মানুষ তাকে প্রতারণার শিকারে পরিণত করে।'

আজও আমি সোমাকে খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে আমরা আজিমপুরে চলে আসি। শেপু আপার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে পলককে বলি,

'কলবেলটা টেপো তো।'

পলক একটু ইতস্তত করে বলে, 'এটা কার বাসা?'

'সেটা পরে জানলেও চলবে। তোমাকে কলবেল টিপতে বলেছি, তুমি কলবেল টেপো।'

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে কলবেলটা টেপে পলক। একটু পরই নিলয় এসে গেটটা খুলে দেয়। আমাকে দেখেই সে চিৎকার করে বলে, 'দস্ত্যন মামা!'

মাছটা ওর হাতে দিয়ে পলকদের দেখিয়ে বলি, 'এরাও তোর মামা। এ হচ্ছে রিছিল মামা, এ পলক মামা, আর এ হচ্ছে বিপ্লব মামা। চল চল, বাসার ভেতর চল। আপাকে ডাক।'

আপাকে ডাকতে হলো না। শব্দ শুনে শেপু আপা এগিয়ে এসে আমাকে দেখেই বললেন, 'কিরে, এত রাত করে কোথা থেকে?'

'রাস্তা থেকে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।' আপা রিছিলদের দিকে তাকালেন। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি বললাম, 'আপা, ওরা আমার বন্ধু। রিছিল, বিপ্লব আর পলক। বোয়াল মাছ আর লাউয়ের তরকারি দিয়ে ভাত খেতে ওদের খুব ইচ্ছে করছে।'

'তুই তাই লাউ আর বোয়াল মাছ কিনে এনেছিস, না? থাপ্পড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব— ।'

আপা দাঁত খুলে ফেলার আগেই সাত্তার ভাই পাশের রুম থেকে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এসে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'দেখো, শয়তানটার কাণ্ড দেখো। বোয়াল মাছ দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে, আর উনি বোয়াল মাছ কিনে এনেছেন।'

'খারাপ কী করেছে?'

'ওর কি টাকার গাছ আছে, না ও কামাই-রুজি কিছু করে।'

'ঠিক আছে, এনেই যখন ফেলেছে— ।'

'এনে ফেলেছে মানে কী? বোয়াল মাছ দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করেছে, আমাকে একটু ফোন করে জানালে হতো না! আর একদিন এ রকম কিছু কিনে বাসায় আসিস, দেখিস কী করি তোকে।' নিলয়ের হাত থেকে মাছটা হাতে নেন আপা। সঙ্গে সঙ্গে সাত্তার ভাই বলেন, 'ভাত খাওয়ার আগে কিছু খেতে দেবে নাকি ওদের?'

'না, এখন অন্য কিছু খেলে ভাত খেতে পারবে না।' রিছিলদের দিকে

তাকিয়ে আপা বলেন, 'তোমরা হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে রান্না শেষ করছি। ডবল গ্যাসের চুলা আমার, রান্না হতে বেশি দেরি লাগবে না। নিলয়, লাউ দুটো নিয়ে আয় তো।'

আপা ভেতরের ঘরে যেতেই সাত্তার ভাইয়ের সাথে রিছিলদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। দু মিনিট পর আপা দৌড়ে এসে বললেন, 'মাছটা কিনেছে কে?'

'কেন, আমরা সবাই।'

'দেখে কিনেছিস?'

'দেখেই তো কিনলাম। বোয়াল মাছ না ওটা?'

'বাইরে থেকে ওটা বোয়াল মাছ ঠিকই আছে। ভেতরটা বোয়াল মাছের আর কিছু নাই। পচে-টচে একাকার হয়ে গেছে।'

'সর্বনাশ!'

'রাত করে মাছ কিনবেন আপনারা আর সেটা ভালো মাছ পাবেন, এটা কখনো হয়! বোয়াল মাছ কাল খাওয়াব তোদের, এখন যা আছে তা দিয়ে খা। এই যে—।' আপা ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কোনা অসুবিধা হবে তোমাদের?'

রিছিল বেশ লজ্জা পেয়ে বলে, 'না আপা।'

'তোমরা তো এখনো বসে আছ, হাতমুখ ধুয়ে নাও। ভাত বোধহয় একটু কম পড়বে, ভাতটা রান্না করছি আমি। রান্না হলেই টেবিলে আসবে তোমরা। সারা দিন কোথায় না কোথায় ঘুরেছ, নিশ্চয় অনেক খিদে পেয়েছে। এই—।' আপা সাত্তার ভাইকে বলেন, 'এই, তুমি ভেতরে আসো তো।'

সাত্তার ভাই আর আপা ভেতরে চলে গেলে পলক বলল, 'ইনি তোমার কেমন আপা হয়?'

আমি নির্দ্বিধায় বলি, 'আপন বড় আপা।'

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দন্ত্যন রুহমান

বাবা আমাকে দেখেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, 'কোথায় কোথায় যে থাকিস না তুই! একদিন দুদিন হলে নাহয় কথা ছিল, ম্যারাথনভাবে বাসার বাইরে থাকিস। এদিকে বাসায় মহা একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।' আমার হাত ধরে বাবা বাসার ভেতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'আয় আয়, তোর সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আমার।'

'কোনো খারাপ কিছু বাবা?'

'খারাপ কিছু হতে যাবে কেন! তোদের ধারণা হচ্ছে আমি সব সময় খারাপ কিছু বয়ে নিয়ে বেড়াই। ব্যর্থ মানুষ তো। ব্যর্থ মানুষের সবকিছুই মানুষ খারাপ চোখে দেখে।'

'স্যরি বাবা, ওভাবে মিন করে বলিনি।'

'ওকে।' বাবা হঠাৎ থেমে বলেন, 'একটা সিগারেট হলে ভালো হতো। সিগারেটটা খেতে খেতে কথাটা বলতে পারতাম।'

'তুমি ঘরে গিয়ে বসো, আমি সিগারেট এনে দিচ্ছি।'

'ছি ছি, তুই সিগারেট আনাতে যাবি কেন! নীতিগতভাবে এটা ঠিক হবে না। যদিও সিগারেট খাওয়াটাও নীতিগতভাবে ঠিক না। সে জন্য তো এ বাজে জিনিসটা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আজ একটা খেতে ইচ্ছে করেছ। দিস ইজ লাস্ট। মাত্র একটা সিগারেট, তারপর সব ডিসমিস। তুই যা, আমি যাব আর আসব।'

সিগারেট কিনতে বাবা হনহন করে বাসার বাইরে চলে গেলেন। অথচ বাবা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর হলো। এর আগে বাবা একটা সিগারেটকে দু টুকরো করে খেতেন। সংসারের খরচ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা সিগারেট খাওয়াও কমিয়ে দেন। একদিন এক বৃহস্পতিবারে বাবা আমাদের সবাইকে মিটিং করার জায়গাটায় বসান। তারপর মুখটা হাসি

হাসি করে বলেন, 'একটা সুসংবাদ আছে।'

লুবা কিছুটা শব্দ করে বলে, 'তোমার বেতন বেড়েছে বাবা?'

'না।'

'তুমি লটারি জিতেছ তাহলে?'

'না। লটারি জিতিনি আমি। তোমরা তো জানো, আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী নই, কর্মে বিশ্বাসী।'

'তাহলে সুসংবাদটা কী, বাবা?' লুবা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

বাবা মিতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুই বলতে পারবি মা?'

মিতি একটু ভেবে বলে, 'তোমার কি কোনো স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, বাবা?'

'আমার তো কোনো স্বপ্ন নেই, তাই পূরণ হওয়ার প্রশ্নটা অবান্তর। এ ছাড়া যেসব মানুষের স্বপ্ন থাকে, তাদের কিন্তু একটা-দুটো স্বপ্ন থাকে না, অনেকগুলো স্বপ্ন থাকে। সুতরাং দু-একটা স্বপ্ন পূরণ হলে তারা কিন্তু তেমন খুশি হয় না। কিছু বুঝলে? স্বপ্নগ্রস্ত হওয়া হচ্ছে একটা ব্যাধি!'

'তুমি কি আমাদের এ বাড়িটা বিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

'শরম দিলি রে মা। এই জায়গাটা পৈতৃক সূত্রে পেয়েছিলাম, সেটুকুই, বাকিটুকু ভাবাটা পাপ রে মা পাপ। বাড়ি করার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ছোটখাটো হলেও একটা স্বপ্ন দেখতে হয়। ওই যে বললাম, আমার কোনো স্বপ্ন নেই।' বাবা এবার মনু আপার দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা, তুই বল তো।'

'আমার মাথায় কিছু নেই বাবা, আমি কিছু বলতে পারব না।'

'তবু একটু চেষ্টা কর।'

'নাহ্, চেষ্টা করলেও কিছু বের হবে না।'

'চট করেই কোনো কিছুতে না করতে নেই মা। আচ্ছা ঠিক আছে—।' আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বলেন, 'নজির, তুই বল তো?'

সোজা হয়ে বসি আমি। কিন্তু কিছু বলার আগেই মা রেগে গিয়ে বলে, 'ও কী বলবে! ও তো উদ্ভট কিছু বলে নিজেও হাসবে, সবাইকে হাসাবে। সুসংবাদটা কী, বলে ফেলেন আপনি।'

মানুষ সুসংবাদ বলে হেসে হেসে কিংবা মুখটা হাসি হাসি করে। কিন্তু চেহারাটা কিছুটা অন্ধকার করে বাবা বলেন, 'আজ থেকে আমি সিগারেট খাওয়াটা বাদ দিয়েছি।'

আমরা সবাই বলে উঠলাম, 'কনগ্রাচুলেশন বাবা!'

ছোট করে একটা থ্যাংকস দিয়ে বাবা উঠে চলে যান। আমাদের সবার

মন খারাপ হয়ে যায়। ঘরে চলে যায় সবাই। কেবল মিতি যায় না। ও আমার দিকে তাকিয়ে দুঃখী দুঃখী গলায় বলে, 'বাবা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিল কেন ভাইয়া, জানিস?'

'কেন?'

'সকালে বাবাকে একটা সাবজেক্টে প্রাইভেট করার কথা বলেছিলাম। আমার প্রাইভেট পড়ার টাকা জোগানোর জন্য সিগারেট ছেড়ে দিলেন বাবা।' মিতি আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'খুব খারাপ লাগছে রে ভাইয়া। মনে হচ্ছে, মরে যাই।'

না, মিতি মরে যায়নি। ইন্টারমিডিয়েটে ও ভালো রেজাল্ট করেছে, ঢাকা ভার্সিটিতে ভালো একটা সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছে, নতুন নতুন স্বপ্ন দেখাও শুরু করেছে ও। অর্পাদের বাড়ি দেখিয়ে ও প্রায়ই বলে, 'ভাইয়া, দেখিস, এ রকম বাড়ি আমাদেরও হবে। আমাদের সেই বাড়িটার দোতলায় বড় একটা রুম করব আমি। সেখানে একটা দোল খাওয়া চেয়ার থাকবে। বাবা সেই চেয়ারটাতে বসবেন আর দামি দামি সিগারেট খাবেন।'

আয়েশ করে সিগারেট টানতে টানতে বাবা বাসার ভেতর ঢুকে বলেন, 'কিরে, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে না বললাম ঘরে গিয়ে বসতে! চল চল।'

বাবা আবার হাত ধরে সোজা তার রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবি, তারপর সিদ্ধান্ত দিবি। আমি সিগারেট খাচ্ছি, তুই কি এক কাপ চা খাবি?'

'খাওয়া যায়।'

মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবা বলেন, 'জাহানারা, যাও না এক কাপ চা বানিয়ে আনো।'

কোনো রকম প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়াল মা। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'এক কাপ না, তিন কাপ বানিয়ে আনো।'

'তিন কাপ কেন?'

'আমার আর তোমার জন্যও এনো।'

সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম আমি। মা এবারও কোনো প্রতিবাদ করল না। কিছুটা ধীর পায়ে হেঁটে গেল মা রান্নাঘরে।

খুব দ্রুত মা চা বানিয়ে নিয়ে আসতেই বাবা বললেন, 'আজমল সাহেবের ছোট ছেলে লিওন আছে না, ও তো কাল রাতে দেশে এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'ও তো বিয়ে করতে এসেছে।'

'ভালো তো।'

'কিন্তু আমরা তো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

'আমাদের কিসের সিদ্ধান্ত?'

'ও, আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয়নি। আজমল সাহেব আর আজমল সাহেবের স্ত্রী তো মিতিকে পছন্দ করে রেখেছেন।'

'কিন্তু— ।'

'কিন্তু কী?' বাবা জিজ্ঞেস করেন আমাকে।

আমাদের টিনের বাড়ির ডান পাশে অর্পাদের চারতলা বাড়ি, আর বাঁ পাশে আজমল আঙ্কেলের বাসা। মিতিকে আজমল আঙ্কেল, আজমল আঙ্কেলের স্ত্রী পছন্দ করেন। তাদের ইচ্ছে, লেখাপড়া শেষ হলে মিতির সঙ্গে তাদের ছোট ছেলে লিওনের বিয়ে দেবেন। কথাটা মা-বাবাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেনও তারা। বাবা-মা রাজি ছিলেন, মুখে না বললেও মিতির চেহারা দেখে বোঝা গেছে, রাজি মিতিও। ব্যাপারটা সিডনিতে থাকা লিওনের কানেও গিয়েছিল। তারপর লিওন একটা চিঠি লিখেছিল মিতিকে এ বলে যে, সিডনিতে ওর একটা পছন্দের মেয়ে আছে।

'কিরে, কী ভাবছিস?'

'আজমল আঙ্কেল-আন্টি যে মিতিকে তাদের বউ করতে চান, লিওনের সম্মতি আছে তো?'

'তারা সকালে এসেছিলেন ওই কথাটা বলতে। লিওনের সম্মতি না থাকলে কি তারা আসতেন?' বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেন, 'কিন্তু একটা সমস্যা তো আছে।'

'কী সমস্যা বাবা?'

'মনুকে বিয়ে দেওয়ার আগে মিতিকে বিয়ে দিই কীভাবে?'

'বাবা— ।' আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'বিয়ে তো আর কালকেই হচ্ছে না। আমরা একটু ভাবি।'

'হ্যাঁ, সেটাও ঠিক।' বলেই বাবা তখনই ভাবতে থাকেন। আমি বের হয়ে আসি তার ঘরে থেকে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, মিতি বসে আছে পড়ার টেবিলে। একটা বই খুলে রেখেছে টেবিলে, কিন্তু ও সেটা পড়ছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

বইয়ের দিকে, অন্য কিছু ভাবছে।

কিছুটা নিঃশব্দে মিতির ঘরে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখি আমি। ও আমার হাতের ওপর ওর একটা হাত রেখে বলে, 'ভাইয়া, আমার বোধহয় বাবার জন্য দোতলায় বড় রুমটা বানানো হবে না, চেয়ারও কিনে দেওয়া হবে না, আয়েশ করে বাবার সিগারেট খাওয়াও দেখা হবে না।'

'কে বলল হবে না?'

'আমার মন বলছে।'

'মন তো অনেক কথাই বলে। শোন, কাল আমাকে একজন মেসেজ পাঠিয়েছে মোবাইলে। পড়ে শোনাই তোকে, মন ভালো হয়ে যাবে তোর।

খুব যত্ন করে চকচকে বালিতে তোমার নাম লিখলাম, কিন্তু সেটা ধুয়ে গেল সমুদ্রের পানিতে। মমতায় ছেয়ে ছেয়ে আকাশে তোমার নাম লিখলাম, মেঘ এসে সেটা ঢেকে দিল। মুগ্ধতার শিশিরে তোমার নাম লিখলাম, রোদ সেটা শুষে নিল। মন খারাপ হয়ে গেল আমার। শেষে হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে নাম লিখলাম তোমার। সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল আমার!

কী, মন ভালো হয়েছে?'

'একটু।'

'তাহলে আরেকটা মেসেজ পড়ে শোনাই।

বাজে একটা অভ্যাস আছে তোমার। রাস্তায় বের হলেই আকাশের দিকে তাকাও। আজও তাকালে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাক ইয়ে করে দিল তোমার মাথায়। তুমি একটু থমকে দাঁড়ালে, কিন্তু মন খারাপ হলো না তোমার, দুঃখও জাগল না মনে। কারণ তুমি তখন ভাবছিলে, ভাগ্যিস আকাশে গরুরা উড়তে পারে না!

এবার?'

মিতি হাসতে হাসতে বলল, 'মজার।'

পুরোনো একটা রেডিও আছে বাবার। যখন মন ভালো থাকে, তখন সেটা বাবা বাজিয়ে থাকেন। কিন্তু রেডিওতে আসলে কী বাজে সেটা বোঝা যায় না, মনে হয় রেডিওটা কাঁদছে।

অনেক দিন পর রেডিওটা বাজাচ্ছেন বাবা। বাবার পাশে গিয়ে বসলাম আমি। বাবা চোখ বুজে রেডিওর তালে তালে মাথা আর পা দোলাচ্ছেন। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে বললেন, 'অনেকক্ষণ ধরে একটা জিনিস ভাবছি।'

'কী, বাবা?'

'কথাটা আবার আর কাউকে বলিস না।'

'না, বলব না।'

'ভাবছি, মাঝে মাঝে তোর মতো আমিও বাসা থেকে পালাব!'

'খুবই চমৎকার হবে বাবা।'

'সত্যি বলছিস?'

'একদম সত্যি। বলো, কবে পালাবে?'

'আজকে পালালেই ভালো হতো। কিন্তু পালানোর কথা ভাবলেই তোর মায়ের কথা মনে পড়ে, চোখে তোর মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে। এ রকম একটা মায়াবতী মেয়েকে রেখে আমি কীভাবে পালাই!'

'তাহলে মাকে নিয়েই পালাও।'

'তা কি আর সম্ভব! যদি পালাতেই হয় তাহলে একা পালাতে হবে। মৃত্যুর মতো—চুপচাপ, নীরবে, নিঃশব্দে।'

মনু আপা অফিস থেকে বাসায় ঢুকল। বাবা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দু হাত বাড়িয়ে আপাকে বললেন, 'মা মনু, একটু কাছে আয় তো মা।'

কাছে আসতেই বাবা আপাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি যদি একটা ভুল করে বসি, মা হয়ে তুই কি আমাকে ক্ষমা করে দিবি মা?'

'কিসের ভুল বাবা?'

'আমি জানি না, আমি জানি না।' বলতে বলতে বাবা শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। রেডিওর শব্দের সঙ্গে বাবার কান্নার শব্দটা মিলিয়ে যায় এখানে-ওখানে, আকাশে। তা দেখে লজ্জা পায় চাঁদটা। একটু আগে ভেসে থাকা চাঁদটা মুখ লুকায় মেঘের আড়ালে। সত্যি বলছি, আজ রাতে আমার একটুও ঘুম হবে না, একটুও না।

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দত্তান রুহমান

বদিউল আঙ্কেলের বাসায় ঢোকার আগে মোখলেস ভাই বললেন, 'সাহেবের মাথা বোধহয় ঠিক নাই।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'সারা রাত চিৎকার করেছে।'

'চিৎকার করার কোনো কারণ আছে?'

'সাহেবের আবার কারণ লাগে নাকি! মানুষটা ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে। আগে বেশ ভালোই ছিল। ইদানীং অল্প কিছুতেই খেঁকি দিয়ে ওঠে। কাল বাইরে থেকে এসে বাসায় ঢোকার সময় আমাকে বললেন, মোখলেস, তুমি কিন্তু আগের মতো কাজ করছ না। কথাটা শুনে আমি মাথা নিচু করে ফেলি, ভাবতে থাকি কোন কাজটা ঠিকমতো করছি না। সতেরো বছর ধরে ওনার সঙ্গে আছি, কোনো দিন কোনো কাজে ফাঁকি দিয়েছি বলে মনে হয় না। আমার মাথা নিচু করা দেখে তিনি চিৎকার করে বলেন, কথা বলছ না কেন, মোখলেস! কাজকাম ঠিকমতো করো। নইলে কিন্তু মুশকিল আছে।'

'লোড হয়ে ছিলেন নাকি তখন?'

'উনি তো এখন চব্বিশ ঘণ্টাই লোড হয়ে থাকেন।'

'লোড হয়ে কথা বললে সে কথা না ধরাই ভালো।'

'আর ভালো লাগে না। নানা রকম ঝামেলায় ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গেছি।' মোখলেস চেহারাটা কান্না কান্না করে বলেন, 'সবকিছু ছাড়তে পারলে এখন বাঁচি।'

মোখলেসের ভাইয়ের পিঠে একটা হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমি। মাথা নিচু করে ফেলেন তিনি। পিঠটায় আরো কিছুক্ষণ হাত রেখে বাসার ভেতর চলে আসি।

অর্ণা আমাকে দেখে ফিসফিস করে বলল, 'আপুর মেজাজটা আগুন

হয়ে আছে।'

'কেন?'

'আব্বুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

'কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?'

'প্রতিদিন যা নিয়ে হয়।'

'তোমার আপু এখন কোথায়?'

'আপুর রুমে।'

'একটু ডেকে আনবে?'

অর্ণা ফিক করে হেসে ফেলে বলে, 'আপনি গেলে অসুবিধা কী? যান, আপু ঘরেই আছে।'

টোকা দিয়ে শব্দ করে দরজার সামনে দাঁড়াই আমি। মাথা নিচু করে বিছানায় বসে ছিল অর্পা। ঘুরে আমার দিকে তাকায়। আমাকে দেখেই ঝট করে সোজা হয়ে বসে বলে, 'আপনাকেই এতক্ষণ খুঁজছিলাম। আপনি নাকি সব পারেন, সবার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন! যান, ওই লোকটা মদ খেয়ে ন্যাংটা হয়ে শুয়ে আছে। একটা কিছু করুন।'

'আপনার এত রেগে যাওয়ার কারণ কী?'

'সেটা আপনি বুঝবেন না। আদর্শবান একটা বাবা পেয়েছেন তো, কিছু বুঝতে পারবেন না। ওই রকম মদারু একটা বাবা পেলে বুঝতেন, বাবা কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী?'

'রেগে গেলে কি কোনো কিছুর সমাধান হয়! যেকোনো কিছুর সমাধান করতে হয় ঠান্ডা মাথায়। সম্ভবত আপনার মাথা এখন গরম হয়ে আছে। আপনি বরং একটা কাজ করুন, শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে তার নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন।'

'আমি শাওয়ার ছেড়ে নিচ দাঁড়িয়ে থাকলে আপনি কী করবেন?'

'আমি আর কী করব!'

'মাথা আপনারও গরম হয়ে গেছে। চলুন, দুজন মিলেই শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি আর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই।'

'অন্য কোনো গান গাইলে হয় না?'

'হয়। শাওয়ারের নিচে না দাঁড়িয়ে অন্য কিছু করলেও হয়। আমরা আমাদের ছাদে গিয়ে নাচতে পারি, চিৎকার করে একে-ওকে গালি দিতে পারি, কাউকে কাউকে পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দিতে পারি।'

'আপনি খুব রেগে আছেন।'

'আপনাকে দেখে আরো বেশি রাগ হচ্ছে। ওই লোকটা আপনাকে মাঝে মাঝেই ডেকে নিয়ে গিয়ে ফুসুরফাসুর করে কী বলে আর আপনি তাতে সায় দিয়ে যান। আপনার প্রশ্রয় পেয়েই মাথায় উঠেছে।'

হেসে ফেলি আমি, 'আমি প্রশ্রয় দেওয়ার কে?'

'বাবাকে আপনি বলেননি, মাঝে মাঝে ঘরের ভেতর ন্যাংটো হয়ে থাকা ভালো?' অর্পা বিছানা থেকে উঠে আমার একেবারে সামনে আসে।

'ঠিক ওভাবে বলিনি।'

'কীভাবে বলেছেন? লোকটা এখন প্রতিদিন মদ খায় আর ন্যাংটো হয়ে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকে। লোকটার খেয়াল থাকে না-ঘরে তার দু-দুটো অ্যাডাল্ট মেয়ে আছে।'

'দেখি, আজ কী করা যায়।'

'বাবা আজকেও আপনাকে ডেকে এনেছে। দয়া করে তাকে বোঝাবেন তিনি এ রকম করতে থাকলে আমি একদিন আত্মহত্যা করব।'

'সত্যি করবেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি করব।'

'বিষ খেয়ে, না গলায় দড়ি দিয়ে? যদি বিষ খেয়ে করতে চান তাহলে বাজার থেকে ভালো বিষ কিনে আনতে হবে আপনাকে। সারা দেশে ভেজালে ভরা, শেষে দেখলেন বিষ খেয়েছেন কিন্তু মরছেন না আপনি, মন খারাপ হয়ে যাবে আপনার। আর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চাইলে, ফাঁসির গিট্টু দেয়া শিখতে হবে আপনাকে। ফাঁসির গিট্টু দেয়া কিন্তু সহজ কথা না। আপনাকে এখন থেকেই গিট্টুর প্র্যাকটিস করতে হবে।'

রাগী চোখে অর্পা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি এখন আমার সামনে থেকে যান। আপনাকে অসহ্য লাগছে!'

কিছু বলি না আমি। মুচকি হেসে বদিউল আঙ্কেলের ঘরের সামনে এসে বলি, 'আঙ্কেল, আসব?'

'আসবে মানে কি, তোমাকে তো আমি আসতেই বলেছি। আসো আসো, ঘরের ভেতর আসো।'

'আসব?'

'আহ্, অত ইতস্তত করছ কেন! আমার গায়ে একটা চাদর জড়ানো আছে, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।'

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে আঙ্কেলের ঘরে ঢুকি আমি। সাদা রঙের একটা চাদর জড়িয়ে আছেন তিনি। তবে চাদরটা হাঁটুর ওপর ওঠানো। তিনি আমার একটা হাত টেনে ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, 'শোনো দন্ত্যন, তোমার পরামর্শটা বেশ কাজে লেগেছে আমার। নিজেকে এখন চিন্তামুক্ত মনে হয়, ভারমুক্ত মনে হয়। একেবারে ফ্রেশ লাগে নিজেকে।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'ভালোই মানে কি! খুব ভালো। আগে সারাক্ষণ এটা নিয়ে চিন্তা করতাম, ওটা নিয়ে চিন্তা করতাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তায় অস্থির ছিলাম। আমি মরে যাওয়ার পর এসব ব্যবসা-বাণিজ্য কে দেখবে, বাড়িঘরের কী হবে, এত টাকা-পয়সা কে খাবে? চিন্তাভাবনায় আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর না তুমি বুদ্ধিটা দিলে।' আঙ্কেলের কথা কেমন যেন জড়িয়ে আসছে। তিনি তবু সামনের গ্লাসটা ভরে ফেললেন আবার। বোতলটা রাখতে গিয়ে কাত করে ফেলে দিলেন সেটা। আমি ধরতে নিতে গিয়েই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'পড়ুক, কত আর পড়বে। আমার কি টাকার অভাব পড়েছে। ওরকম দু-চার শ বোতল আমি প্রতিদিন ড্রেনে ফেলে দিতে পারি। কী দন্ত্যন, পারি না?'

'জি, পারেন।'

'তুমি যখন আমাকে ন্যাংটো হয়ে একা একা ঘরের ভেতর বসে থাকতে বলেছিলে, তখন একটু চমকে উঠেছিলাম। এটা কী বলছে ছেলেটা! অনেক ভেবে একদিন সত্যি সত্যি গায়ের সব কাপড় খুলে ফেললাম। প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি, একটু লজ্জা লাগছিল। পরে দেখি সব ঠিক হয়ে গেছে। খুব চিন্তা করে দেখলাম, মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে, তখন সে ন্যাংটো হয়েই তো আসে, তখন তার চিন্তা থাকে না, ভাবনা থাকে না, খালি অ্যা অ্যা করে, আর মায়ের বুকের দুধ খায়। কত নিশ্চিন্ত জীবন, কী ভাবনাহীন! তবে একটা কথা, ইদানীং এ রকম ন্যাংটো হয়ে ঘরের ভেতর আর ভালো লাগে না। কী করি, বলো তো?'

'বাইরে যেতে পারেন আপনি।'

'এ রকম ন্যাংটো হয়েই!'

'জি, এ রকম ন্যাংটো হয়েই। সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে একদিন বাইরে যাওয়ার পর আপনার মনে হবে, সমস্ত পৃথিবী আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে।'

'কিসের আমন্ত্রণ, কিসের অভিনন্দন?'

'প্রকৃতির নিজেরও কোনো আবরণ নেই, কোনো আড়ালে থাকে না সে। তার সবকিছুই উন্মুক্ত, খোলা এবং প্রকাশ্য। এ রকম খোলামেলা দেখে সে তাই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে তার সঙ্গে মিশে যেতে, সে আপনাকে অভিনন্দন জানাবে তার মতো হওয়ার জন্য!'

'তুমি তাহলে আমাকে বাইরে যেতে বলছ?'

'জি।'

'মানুষ কিছু ভাববে না তো, কিছু বলবে না তো?'

'ভাবলেই কি, বললেই কি। প্রকৃতিকে মানুষ অনেক কিছুই বলে, প্রকৃতির কিছু আসে-যায়? সবকিছু ছেড়ে আপনি যখন বাইরে যাবেন, তখন আপনি হবেন প্রকৃতির মতো।'

'তাহলে আজ থেকে শুরু করব, না কাল থেকে?'

'আপনার যখন ইচ্ছে।'

'আচ্ছা দন্ত্যন—।' আঙ্কেল গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলেন, 'তুমি আমাকে এত ভালো ভালো বুদ্ধি দাও কেন, বলো তো? তুমি আমার কে, তুমি কেন আমাকে এত ভালোবাসো?'

কিছু বলি না আমি। চোখ ফেটে জল এসে যায় আমার। প্রতিশোধপরায়ণ আমি নই। তবু একবার, শুধু একবার তোকে ন্যাংটো করে ঘরের বাইরে নেব বদিউল। যে ক্ষতি তুই আমাদের করেছিস, তার সামান্যতম শোধ হবে এতে। বাকিটুকু অন্যভাবে নেব, একেবারে অন্যভাবে!

যত্ন করে মা বোয়াল মাছ আর লাউ দিয়ে তরকারি রান্না করেছে। খেতে বসতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে শেপু আপা ফোন করলেন আমাকে, 'দন্ত্যন, একটু পিজি হাসপাতালে আসতে পারবি?'

'পিজি হাসপাতালে! পিজি হাসপাতালে কেন আপা?'

'খুব জরুরি দরকার আছে।'

'এখনই আসছি আপা।'

বোয়াল মাছ আর লাউ দিয়ে আজও ভাত খাওয়া হয় না আমার, শেপু আপার বাসায়ও সেদিন খাওয়া হয়নি। তার আগেই রিছিল, পলক, বিপ্লব আর আমি চলে এসেছিলাম। কথার ফাঁকে কী একটা প্রসঙ্গে বোয়াল মাছ আর লাউয়ের গল্পটা করেছিলাম, বাবা সেটা শুনেছেন এবং মাছ আর লাউ কিনে

এনেছেন তিনি। বাবারা বোধহয় এ রকমই হন।

পিজি হাসপাতালে পৌঁছে দূর থেকেই দেখি কবিতা, নিপুণ, শেপু আপা, সাত্তার ভাই সবাই এসে হাজির। বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে আমার। চিৎকার করে কাঁদছে নিপুণ। আপা আমাকে দেখেই দ্রুত কাছে এসে বলেন, 'তোর রক্তের গ্রুপ কী?'

'এ-পজেটিভ।'

'ও-নেগেটিভ রক্ত লাগবে, দ্রুত, দুই ব্যাগ।'

'কার জন্য লাগবে?'

'নিপুণের মায়ের একটা জটিল অপারেশন হবে একটু পরই। তোর সাত্তার ভাই, নিপুণের বড় দাদা, আরো কয়েকজন মিলে সারা ঢাকা শহরে ওই গ্রুপের রক্ত খুঁজে বেড়িয়েছে। সব রক্ত আছে, ও-নেগেটিভ নাই, উধাও।'

'মাত্র পনেরো মিনিট টাইম দাও আপা, দেখি আমি কী করতে পারি।'

পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে রিছিলকে ফোন করলাম। রক্তের কথা বলতেই রিছিল বলল, 'আমি বাংলামোটরের কাছে আছি। তুমি দশ মিনিট ওয়েট করো। আমরা আসছি।'

সাত-আট মিনিটের মধ্যে রিছিল, পলক, বিপ্লব এসে হাজির, সঙ্গে ওদের বয়সী আরো চারজন ছেলে। আমাকে দেখে রিছিল বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কার রক্ত দরকার?' ওই চারজনকে দেখিয়ে বলল, 'চার ব্যাগ ও-নেগেটিভ রক্ত রেডি। লাগলে আরো এক ব্যাগ করে দেওয়া যাবে।'

নিপুণ শব্দ করে কেঁদে ওঠে। শেপু আপা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রিছিলের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, 'ভাই রে, অনেকের অনেক ভাই আছে, কিন্তু তোদের মতো ভাই পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।' শেপু আপা চোখ মুছতে মুছতে আমার একটা হাত চেপে ধরেন, চোখ দুটো শিরশির করে ওঠে আমার।

তিন ঘণ্টা পিজিতে থাকার পর চলে এসেছি আমরা। নিপুণের আম্মার অপারেশনটা ভালো হয়েছে। রক্ত দুই ব্যাগই লেগেছে, বেশি লাগেনি। আসার সময় শেপু আপা চারটা পাঁচ শ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় তোদের খিদে পেয়েছে। আমি তো এখন বাসায় যেতে পারব না। কোথাও গিয়ে ওদের নিয়ে কিছু খেয়ে নিস।' টাকাটা নিতে চাইনি আমি। জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছেন আপা।

বেইলি রোডে এসেছি আমরা। এখানকার দোকানগুলোর খাবারের মজাই

আলাদা। ব্যাম্বু ক্যাসল নামে বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা খাবারের দোকান আছে, খুবই মজার মজার খাবার পাওয়া যায় এখানে, তবে দাম একটু বেশি। এ মুহূর্তে দাম বেশি নিয়ে চিন্তা নেই, কারণ পকেটে টাকা আছে, আটজনের খাওয়াদাওয়া বেশ ভালোভাবেই হয়ে যাবে এতে।

হঠাৎ সামনে একটা লোক এসে বললেন, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

ভালো করে লোকটার দিকে তাকালাম। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছেন। তবু তাকে চিনতে পারলাম। বাশার আলী। গুমোট মনটা ভালো হয়ে গেল আমার, 'বাশার ভাই, আপনি! কোথায় ছিলেন এত দিন! আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমার প্রায় পাগল হওয়ার অবস্থা।'

'অসুখে পড়েছিলাম। বিছানায় শুয়ে থেকেছি আর কেঁদেছি।'

'এখন কী অবস্থা?'

'এখন একটু ভালো।' বাশার আলী মাথা নিচু করে বলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।'

'কথাটা পরে শুনি। তার আগে আসেন আমরা কিছু খেয়ে নিই।'

কোনার টেবিলটাতে আমরা নয়জন বসি। একটু পর খাবার এসে যায়। সবাই খাওয়া শুরু করি। কিন্তু বাশার আলী খাবার মুখে দিয়েই পেটে হাত দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। পলক লাফ দিয়ে উঠে বাশার আলীকে চেপে ধরে বলে, 'কী হয়েছে আপনার?'

চোখে পানি এসে গেছে বাশার আলীর। কিছুটা কাতরাতে কাতরাতে তিনি বললেন, 'তেমন কিছু না। দু দিন ধরে না-খেয়ে আছি তো, হঠাৎ এত ভালো খাবার পেটে পড়ায় পেটটা যেন কেমন করে উঠল!'

খাবার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আমার। এই যে রঙিন ঢাকা শহর, এই যে ঝলমলে এত কিছু, এই যে এত মানুষ! কিন্তু বোঝার উপায় নেই, এখানে কত মানুষ না-খেয়ে থাকে, কত মানুষ খালি-পেটে ঘুরে বেড়ায় এদিক-ওদিক!

দেশে অনেক রহমান
টাইটেলধারী মানুষ আছেন।
তাদের মধ্যে কেউ হয়েছেন রাহমান,
কেউ হয়েছেন রেহমান,
কিন্তু এই প্রথম
একজন হয়েছেন রুহমান!

দন্ত্যন রুহমান

সম্পূর্ণ মাথা ন্যাড়া মেয়েটির! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে। প্রতিমার মতো সুন্দর সে। প্রতিমার মতো তার চোখ, ঠোঁট, ভ্রূ—সবকিছু। কেবল নাকটা একটু চ্যাপটা। ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। খুক্ করে একটু কাশি দিতেই সে একটু নড়ে বসে বলল, 'ডাক্তার আমাকে বিছানা থেকে উঠতে নিষেধ করেছেন। বাবা আপনার কথা বলতেই আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। বাবাকে বললাম, তোমরা একটু অন্য ঘরে যাও, আমি ওনার সঙ্গে একটু একা কথা বলব। আমার অনেক কষ্ট, তবু আজ অনেক আনন্দ হচ্ছে, আনন্দে চোখে পানি এসে যাচ্ছে আমার।'

'আমি আসলে ব্যাগটা অনেক আগে কুড়িয়ে পেয়েছি। দুবার আপনাদের এই বাসায় এসেছিও। কিন্তু দুবারই দরজায় তালা লাগানো ছিল। আশপাশের লোকজনও তেমন কিছু বলতে পারেনি, আপনারা কোথায় গেছেন।' আমি একটু হেসে বলি, 'বেশ যন্ত্রণা দিয়েছে ব্যাগটা।'

'আমরা এই টাকার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আমাদের আর টাকা ছিল না, ব্যাংকে যা ছিল সব টাকা বাবা তুলে ফেলেছিলেন। যেভাবেই হোক পথে ব্যাগটা মিসিং হয়ে যায়। আমাদের কেউ নেইও যে এতগুলো টাকা ধার দেবে। গ্রামে কিছু জমি ছিল, বাবা সেগুলো বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। বাবাকে তখন বলেছিলাম, যে অসুখ হয়েছে, বাঁচি কি মারা যাই, শেষবারের মতো গ্রামটা দেখে আসি। তাই সবাই মিলে হঠাৎ গ্রামে গিয়েছিলাম।'

'আপনার কী হয়েছে?'

'ব্রেনের একপাশের নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে শুকাতে থাকলে একসময় আমি পঙ্গু হয়ে যাব, মারাও যেতে পারি।'

'বাইরে যাবেন চিকিৎসা করাতে?'

'হ্যাঁ। এ দেশে অনেক চিকিৎসা করালাম, কিছু হলো না। শেষে ডাক্তাররা সিঙ্গাপুর যেতে বলেছেন।'

'সেখানে গেলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'ফিফটি-ফিফটি।' মেয়েটি ম্লান হেসে বলে, 'জানেন, কিছু হলেই আগে মরতে চাইতাম। কত কি করেছি ছোট্ট এ জীবনে! স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ-ভার্সিটিতে বিতর্ক করেছি, বিতর্কে কয়েকবার প্রথম হয়েছি। কবিতা আবৃত্তি করেছি, সেখানেও কয়েকবার প্রথম হয়েছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি, পুরস্কার পেয়েছি। অসুখটি ধরা পড়ার পর আর মরতে ইচ্ছে করে না, সারাক্ষণই মনে হয়, যদি সুস্থ হতে পারতাম, বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারতাম! রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতো—আকাশ তবু সুনীল থাকে, মধুর ঠেকে ভোরের আলো, মরণ এলে হঠাৎ দেখি, মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।'

'একদম সত্যি কথা।'

'মৃত্যুটা এখন খুব কষ্টের মনে হয়, বড় নির্মম মনে হয়।'

'আমার এখন খুব ভালো লাগছে, অবশেষে টাকাগুলো যথাস্থানে ফেরত দিতে পেরেছি। আমি কি এখন যেতে পারি?'

'অবশ্যই। তার আগে একটা অনুরোধ আছে আমার।'

'বলুন।'

'আমার তো কোনো ভাই নেই। বড় ভাইয়ের মতো আমার মাথায় একটা হাত রেখে স্রষ্টার কাছে একটু বলবেন, আমি যেন ভালো হয়ে যাই। আমার বিশ্বাস, আপনার মতো ভালো মানুষের কথা স্রষ্টা শুনবেন।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম মেয়েটার দিকে। তার চুলবিহীন মাথায় হাতটা রাখতেই সে খপ আমার হাতটা চেপে ধরল, তারপর শব্দ করে কেঁদে উঠে বলল, 'আমি আরো একটু বাঁচতে চাই ভাইয়া; আরো একটু, আরো একটু...।'

বেশ নির্ভার লাগছে এখন, কাঁধটাও খালি খালি লাগছে। অনেক দিন পর আজ কোথাও ঘুমাব না, কোথাও বসব না, শুধু হাঁটব, হাঁটব আর হাঁটব। আকাশে চাঁদ উঠেছে, বেশ বড়সড় চাঁদ, সম্ভবত আজ পূর্ণিমা। আমি নিশ্চিত, বাবা এখন বারান্দায় বসে আছেন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন চাঁদের দিকে আর একটু পর পর সক্রেটিসের কথাটা ধার করে বলছেন—I to die, you to live, which is better, only God knows.

চারদিকে এত মানুষ, তবু একা লাগছে। ঘণ্টা দুয়েক আগে চৈতী একবার ফোন করেছিল, রিসিভ করিনি। ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার—কেন ফোন করেছিল?

পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে চৈতীকে ফোন করলাম। ফোন বাজল, ও রিসিভ করল না, কেটে দিল। চৈতী এ রকমই, আমার ফোন কখনও রিসিভ করে না, কেটে দিয়ে নিজেই ফোন করে। মোবাইল বাজছে আমার, চেয়ে দেখি চৈতী করেছে। ফোনটা রিসিভ করতেই চৈতী বলল, 'তুমি এ মুহূর্তে কোথায়?'

'রাস্তায়।'

'রাস্তায় কোথায়?'

'বাড্ডা থেকে বেইলি রোডের দিকে যাচ্ছি।'

'বাসায় যাবে না আজ?'

'না। আজ সারা রাত ঘুরব।'

'আমি কি একটু আসতে পারি?'

'ভালো লাগছে না বাসায়?'

'না।'

'আসো—।' আমি একটু থেমে বলি, 'আসো, তোমার সঙ্গে একটা মানুষের পরিচয় করিয়ে দেব আজ।'

'সেই মানুষটা, যার জন্য তুমি আমাকে একটা অনুরোধ করবে?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে, নো প্রবলেম।'

বেইলি রোডে এসে দেখি চৈতী আগেই এসে উপস্থিত। গাড়ির ভেতর বসে আছে ও। আমাকে দেখেই গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'তোমার ওই লোকটা কই, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিলে?'

'আছে। তুমি একটু বসো, আমি এখনই ডেকে আনছি।'

গাইড হাউসের সামনে বাশার আলীর বসে থাকার কথা। গতকাল ব্যাম্বু ক্যাসলে খাওয়ার পর সে কথাই বলেছিলেন তিনি। গিয়ে দেখি, বাশার আলী সত্যি সত্যি বসে আছেন সেখানে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে ম্লান একটা হাসি দিলেন। আমি তার একটা হাত ধরে বললাম, 'কখন এসেছেন এখানে?'

'অনেকক্ষণ। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তো।'

'চলুন, আপনাকে একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে চৈতী। আমাদের দেখেই ঘুরে দাঁড়াল ও। আমি ওর পাশে গিয়ে বাশার আলীর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম, 'ইনি হচ্ছেন বাশার আলী। অদ্ভুত করে গল্প বলতে পারেন তিনি।'

'কী রকম?' চৈতী হেসে হেসে বলে।

'খুবই অদ্ভুত। ওনার যেকোনো একটা গল্প শুনলে অন্তত দু ঘণ্টা তুমি অন্য কিছু ভাবতে পারবে না।'

'তাই নাকি!'

'বলতে পার ওনার পেশাই হচ্ছে গল্প বলা। এই গল্প বলে তিনি যা রোজগার করেন, তা দিয়ে তিনি তার গ্রামে থাকা ভাই-বোনদের লেখাপড়া শেখান আর নিজে বেঁচে থাকেন।'

'গল্প বলে টাকা রোজগার করা যায় নাকি?'

'এটাকে ঠিক রোজগার বলা যায় না।'

চৈতী একটু হেসে বলে, 'তুমি যে অনুরোধটা করতে চেয়েছ, সেটা বোধহয় আমি বুঝতে পেরেছি।' বাশার আলীর দিকে চৈতী তাকিয়ে বলে, 'যাওয়ার সময় আমি একটা ঠিকানা দিয়ে যাব। কাল আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন সেখানে। আপনার কোয়ালিফিকেশন...।'

চৈতী শেষ করার আগেই বাশার আলী বেশ উৎসাহ নিয়ে বলেন, 'ডিগ্রি পাস করেছি আমি। সাত নম্বরের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পাই নাই।'

'চলবে।'

বাশার আলীর মুখের দিকে তাকাই আমি। মুখটা হঠাৎ করে চকচক করছে তার। চৈতী গাড়িতে উঠে বসে, আমাদেরও ইশারা করে উঠে বসতে। আমরা উঠে বসতেই চৈতী বলে, 'আজ অনেকক্ষণ গাড়ি নিয়ে ঘুরব। তোমার কোনো সমস্যা নেই তো দন্ত্যন?'

'না।'

'বাশার ভাই, আপনি কি আপনার একটা অদ্ভুত গল্প শোনাবেন এখন?' চৈতী হেসে হেসে বলে।

'আপা—।' বাশার আলী উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'আমার মনে এখন সীমাহীন আনন্দ। আনন্দে সব গল্প এ মুহূর্তে ভুলে গেছি আপা।'

গাড়ির ভেতর গুটিসুটি মেরে বসে আছেন বাশার আলী। আমি তার দিকে তাকিয়ে বলি, 'আজ আমি একটা গল্প শোনাব আপনাকে, অদ্ভুত গল্প। চৈতী, তুমিও শোনো।'

সিটের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে ছিল চৈতী। আমার কথা শুনে আমার দিকে ঘুরে বসে ও। আমি একটু সময় নিয়ে বলি, 'কয়েক দিন পর একটা ছেলের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষা ফিসের টাকা নেই তার। বাবা সামান্য চাকরি করেন, সংসার চালাতেই সব শেষ হয়ে যায় তার। তা ছাড়া

ছোট দুটো বোনেরও লেখাপড়ার খরচ দিতে হয় বাবাকে। ছেলেটা ভাবে, সে পরীক্ষা দেবে না।

পরীক্ষা না দেয়ার সেই মনোভাব বুঝতে পারে ছেলেটার বড় বোন। পরীক্ষার ফিসের টাকা জোগাড় করার জন্য তাই সেই বোনটা পাশের বাসার এক ধনাঢ্য মাতাল লোকের কাছে যায় এবং টাকাটা নিয়ে আসে। টাকা পেয়েও ছেলেটা পরীক্ষা দেয় না।' আমি চৈতীর দিকে তাকিয়ে বলি, 'জানো, কেন?'

চৈতী আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কেন?'

বাশার আলীর দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'আপনি বলতে পারবেন, কেন?'

কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে বাশার আলী বলেন, 'না।'

'ছেলেটা বুঝতে পেরেছিল, টাকা দেয়ার আগে ধনাঢ্য সেই মাতাল লোকটা তার বোনের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।'

'তারপর?' চৈতী আমার একটা হাত খামচে ধরে বলে।

'তারপর ছেলেটা কদিন পর পর বাড়ি থেকে পালায় আর রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়!'

চৈতী আর কোনো প্রশ্ন করে না।

সামনের দিকে তাকিয়ে আছি আমি, গাড়ি শোঁ শোঁ চালাচ্ছে ড্রাইভার। বর্ণিল ঢাকা রাতে আরো বর্ণিল হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয়ে আমি সেই বর্ণময় রূপ দেখছি আর টের পাচ্ছি, চৈতীর হাতটা আরো জোরে খামচে ধরছে আমার হাতটাকে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শব্দহীন গাড়ির ভেতর অদ্ভুত নিঃশব্দতা, কেবল একটু পর পর নাক টানছে চৈতী। হঠাৎ এক ফোঁটা গরম জল এসে পড়ে আমার হাতের উল্টোপিঠে—কিছু না, শুধু কষ্টের সাক্ষী হয়ে।

গাড়িটা চলছেই। হায়, গাড়িটা যদি চলতই, কখনো যদি না থামত! কিন্তু গাড়ি থেমে যাবে, থেমে যাবে একদিন সবকিছু! কী লাভ তাহলে এত কিছু ভেবে! থাক, থাক না!